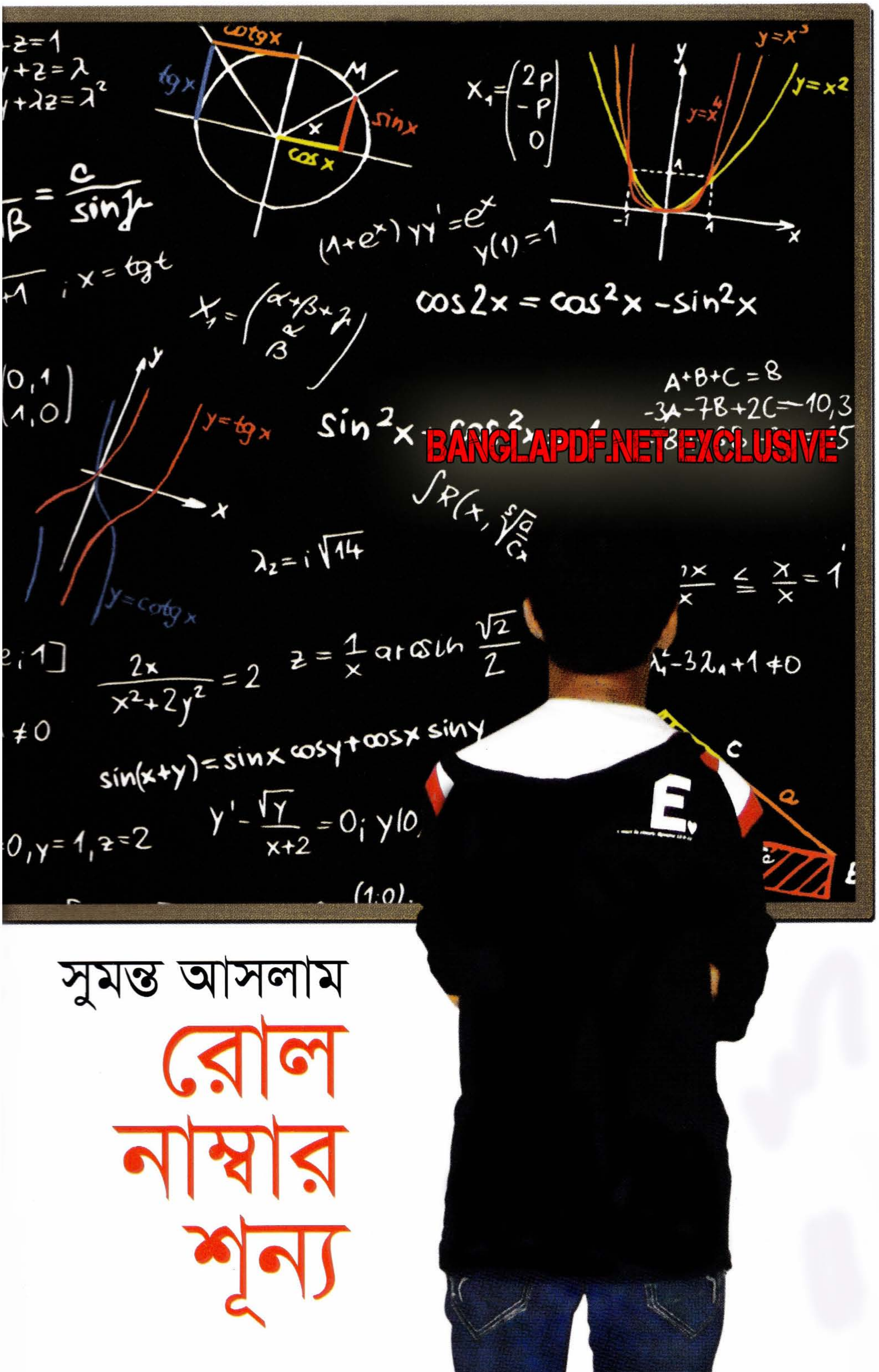

BANGLAPDF.NET EXCLUSIVE

সুমন্ত আসলাম

রোল নাম্বার শূন্য

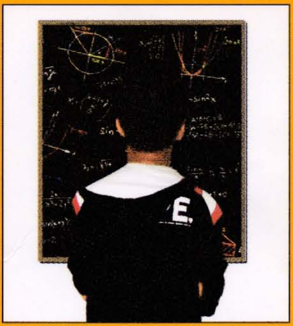

'তুমি কয়দিন এই স্কুলে পড়তে চাচ্ছ, ভালো। কিন্তু বড় ধরনের দুষ্টুমি করে কোনো ক্ষতি করবে না তো আমাদের।' হেড স্যার চেয়ারটা আরো একটু পেছনে ঠেলে বললেন, 'তোমাকে বিশ্বাস করব কীভাবে আমরা!'

'বিশ্বাস আসলে অন্য রকম জিনিস স্যার।' রাসাদ মাথা চুলকাতেই চুলকাতেই বলল, 'বিশ্বাসের ইংরেজি হচ্ছে Believe। এই Believe-এর মাঝেই কিন্তু lie লুকিয়ে আছে, যার মানে মিথ্যা।'

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন রাসাদের দিকে। আবার ঘামতে শুরু করেছে সে। এতক্ষণ সে যা বলেছে, তার সবগুলোই মিথ্যা বলেছে সে। দুর্দান্ত একটা কাজ করতে সে এই স্কুলে এসেছে। আপাতত কাউকে বলা যাবে না সেটা। খুব গোপনভাবে কাজটা করতে হবে তার। কেউ টের পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে স্কুলের, স্কুলের সব ছাত্রের!

প্রচ্ছদ :: সুহর্ষ সৌম্য

নিজের উদ্ভাবিত অ্যাকুরিয়ামের জলে মানুষটির ছায়া পড়তেই চঞ্চল হয়ে ওঠে পোষা মাছগুলো—দেখে চোখ ভিজে যায় তার। ঘরের কার্নিশে নিজের হাতে বানিয়ে দেওয়া পাখির বাসায় চড়ুই দম্পতির বাচ্চাগুলো টিউ টিউ করে উঠলে খুশিতে দিশেহারা হয়ে যায় সেই মানুষটি। শখের ছোট্ট গোলাপ বাগানে ফুটে থাকা পাঁচ রঙের গোলাপে রঙিন হয়ে ওঠে তারই চোখের মণি।

এত সব ছোট ছোট আনন্দের উপলক্ষ ছুঁয়ে থাকা মানুষটিই আবার কখনো কখনো হারিয়ে যায় একান্ত নিজের জগতে—যখন সে থাকে তার লেখার টেবিলে, তার আঙুল থাকে যখন ল্যাপটপের কি-বোর্ডে। লেখালেখি তখন তার ধ্যান। আমরা, কাছের বন্ধুরা তার বারো বাই বারো ফুট ঘরটাকে তখন বলি 'উপাসনালয়'—সুমন্ত আসলামের 'উপাসনালয়।'

লেখালেখি তার ধ্যান বলেই খুব অল্প দিনেই সে পেয়েছে জনপ্রিয় লেখকের স্বীকৃতি। তার লেখনী আমাদের কথা বলে বলেই সে পরিচিত তার কলাম দিয়ে। লোক সমাগম এড়িয়ে যেতে চাওয়া এ মানুষটার সাথে প্রথম পরিচয়ে তাই সবাই বলে, 'ও, আপনি "বাউণ্ডুলে"র সুমন্ত আসলাম!'

নতুন নতুন গল্প মাথায় নিয়ে প্রতিনিয়ত তার বসবাস, এটার প্রমাণ মেলে প্রতিটা একুশে বইমেলাতে। অভিনব সব কাহিনিবিন্যাসে প্রতিবারই সে হাজির হয় ভক্ত পাঠকদের চমকে দিতে।

তার সরল অথচ হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া লেখায় যে একবার মজেছে তার পক্ষে অসম্ভব বেরিয়ে আসা এই মোহ থেকে।

শুধু লেখনীর মোহ নয়, ব্যক্তি সুমন্তও মোহগ্রস্ত করে রাখে তার কাছের মানুষদের। ক'দিন পরপরই তাই সে হাজির হয় আয়োজকের ভূমিকায়—কখনো বন্ধুময় আড্ডার, কখনোবা পারিবারিক পুনর্মিলনীর।

তার আপ্যায়ন থেকে বাদ যায় না সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুগুলোও। নতুন বছরের প্রথম দিন হোক কিংবা হোক ঈদ—এদের সাথেই তার মিলেমিশে উদ্‌যাপন। তা দেখে জলে ভিজে যায় আমাদের চোখ। এসব সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সে গড়ে তুলেছে একটি সংগঠন—'Childream Society'।

জীবনবঞ্চিত মানুষদের বাঁচতে শেখায় যে সুমন্ত সে বেঁচে থাকুক সকলের আশীর্বাদে—তার হাতে আরো অনেক অনেক বছর ভীষণ অর্থময় হয়ে উঠুক শব্দগুলো—কখনো প্রতিবাদের তীব্রতায়, কখনো আনন্দের উন্মাদনায়, কখনোবা ভালোবাসার আকুলতায়।

—কাছের বন্ধুরা

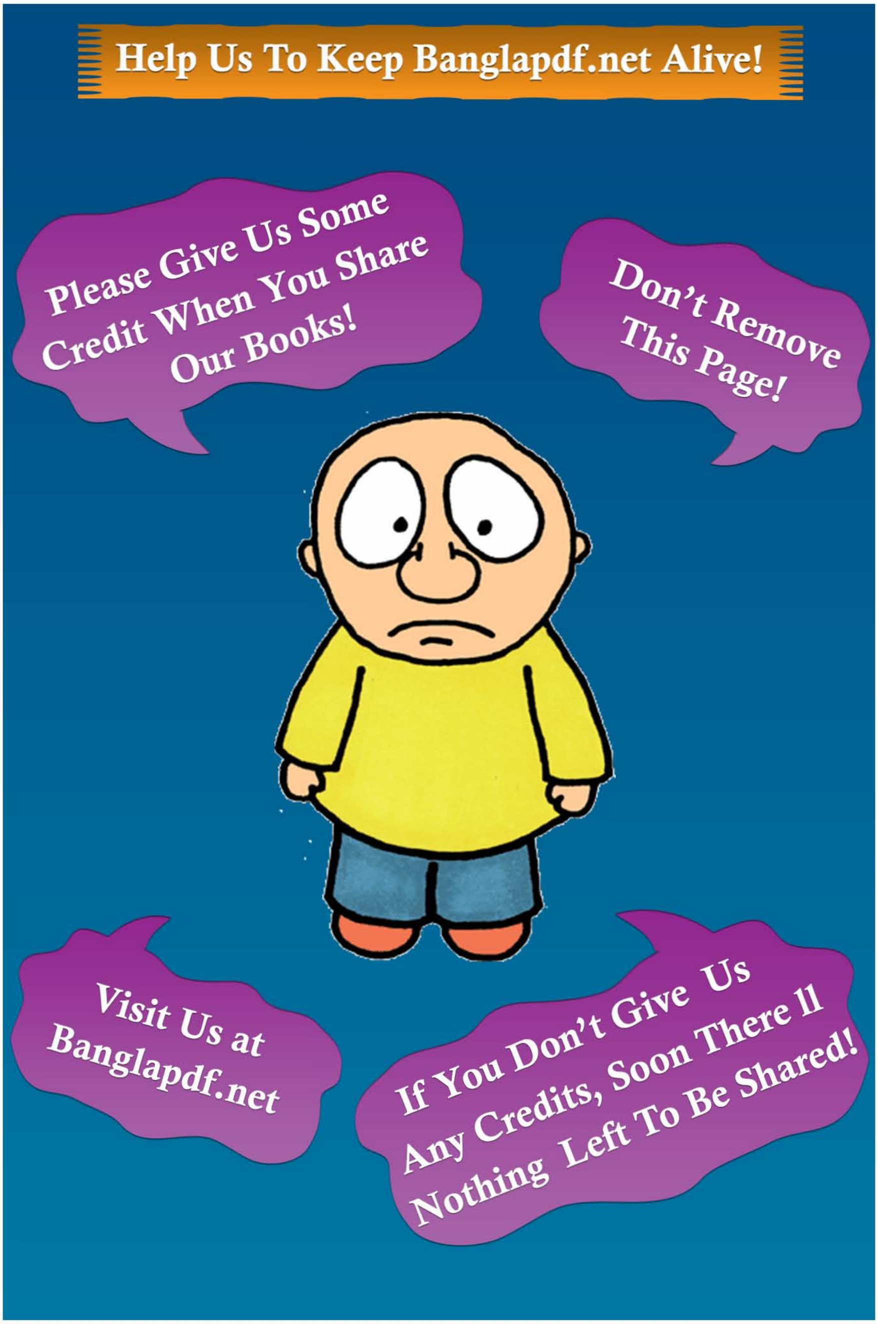

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

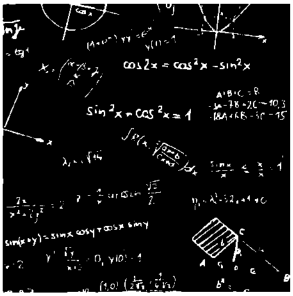

রোল নাম্বার শূন্য

সুমন্ত আসলাম

রোল নাম্বার শূন্য

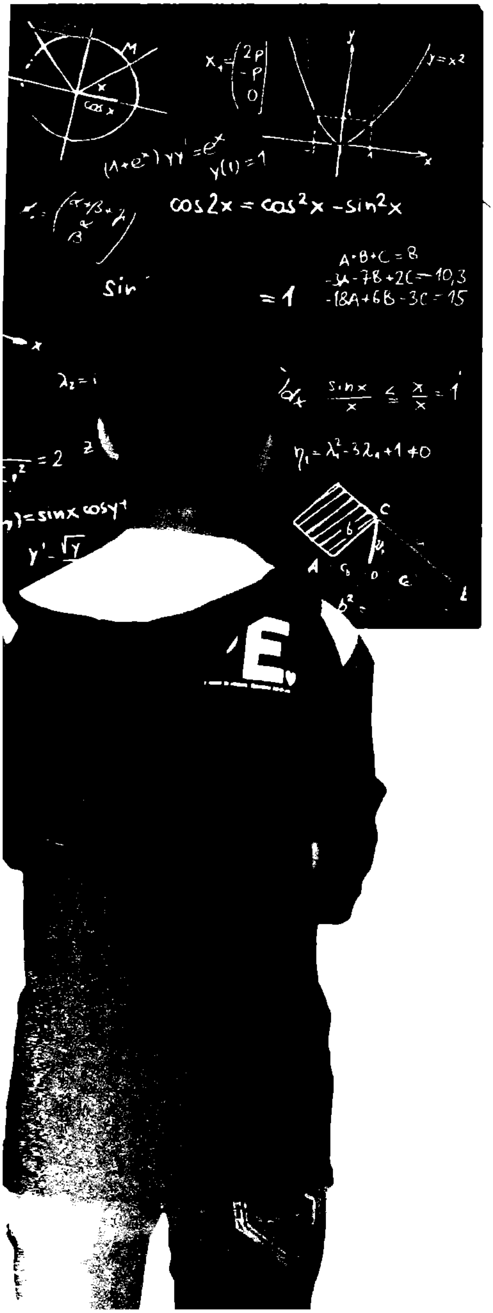

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com

ফেব্রুয়ারি ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সুহর্ষ সৌম্য

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম
একশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 978 984 90862 9 1

Roll Namber Shunna by Sumanto Aslam
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published February 2014, Cover Design Suharsha Somma
Price 150.00 Taka Only

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited,** 22 Brick Lane, London
U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara,** 37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372
Canada Distributor ❑ **Anyamela,** 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202
Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog,** 206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India
অনলাইনে পাওয়া যাবে ❑ রকমারি.com, www.rokomari.com

আমার শ্বশুরবাড়ির চারতলা বিল্ডিংয়ের তিনতলাতে যিনি ভাড়া থাকেন, তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। বলা চলে এখনো আছেন। সাংবাদিকরা যে যেখানেই কাজ করুক না কেন, সবাই দেশসেবক, দেশের মানুষের কথা লেখে। একজন ভালো মানুষ তিনি। একদিন চা খেতে খেতে তিনি আমাকে বললেন, 'আমার মেয়ে তো আপনার একটা বই মুখস্থ করে ফেলেছে!' শুনে আমার তো আকাশে ওঠার অবস্থা। ভাগ্যিস, ঘরের ভেতর ছিলাম, ঘরের ছাদ ছিল। সেই গুণবতী মেয়েটার নাম হচ্ছে ইউসরা।

প্রিয় মামণী, প্রিয় ইউসরা শারফুদ্দীন

তুমি যে অনেক বড় হবে, এটা আমি নিশ্চিত বলতে পারি। যারা বই পড়ে, তারা কোনো দিন ছোট থেকেছে, পৃথিবীর কেউ এটার প্রমাণ দিতে পারবে না।

সময় তাদের জন্য খুব ধীর, যারা অপেক্ষা করে। যারা ভয় করে, তাদের জন্য খুব দ্রুত। তাদের জন্য খুব দীর্ঘ, যারা শোক করে। যারা আনন্দ করে, তাদের জন্য ক্ষুদ্র। কিন্তু যারা ভালোবাসে, তাদের জন্য সময় অমর।

—হেনরি ভ্যান ডাইক

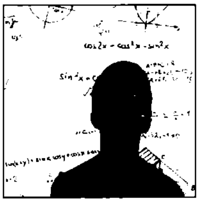

রাসাদ আলতো করে হাত রাখল দরজায়। বুকটা অল্প অল্প কাঁপছে তার। কাঁপছে পা দুটোও। একটু পর খেয়াল করল, সমস্ত শরীরটাই কাঁপছে, আস্তে আস্তে কাঁপছে। ভয় ভয় লাগছে খুব। হাত সরিয়ে নিল সে দরজা থেকে। মাথা ঘুরিয়ে প্রথমে ডান পাশ, তারপর বাম পাশটা দেখে নিল দ্রুত। কেউ নেই আশপাশে। দরজার কাছে যে কাঠের উঁচু টুলটা আছে, কেউ নেই সেখানেও। খালি পড়ে আছে সেটা। রাসাদের মনে হলো, ওই টুলটাতে চুপচাপ বসে থাকবে কিছুক্ষণ। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়েই অস্থির হয়ে গেল সে। বেশি সময় নেই। আর একটু পর সবাই বের হয়ে আসবে রুম থেকে। তখন আর কোনো কাজ হবে না।

দরজায় আবার হাত রাখল রাসাদ। ঠেলা দিয়ে যেই খুলতে যাবে ঠিক তখনই লোকটাকে দেখতে পেল সে। এক হাতে চায়ের ফ্লাস্ক, আরেক হাতে কীসের যেন একটা প্যাকেট। দ্রুত সরে দাঁড়াল সে দরজার পাশে। কিন্তু লোকটা এসেই সামনে দাঁড়ালেন তার। কিছুটা গম্ভীর গলায় বললেন, ‘তোমাকে তো চিনলাম না। তুমি কি কাউকে খুঁজছ?’

‘জি।’ কিছুটা অস্পষ্ট স্বরে বলল রাসাদ। তারপর টানটান সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখে বলল, ‘আমার নাম রাসাদ। আমি এই স্কুলের হেড স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।’ রাসাদ একটু থেমে বলল, ‘যদি কোনো সমস্যা না হয় আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?’

‘আমি হেড স্যারের পিয়ন। আমার নাম সালামত খান।’

‘আপনাকে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু খুব পরিচিত মনে হচ্ছে আপনাকে। আমার এক দাদু ছিল, ঠিক আপনার মতো দেখতে। আপনার মতোই সাদা বড় বড় গোঁফ ছিল তার। মাথার চুলও পাকা ছিল।’

‘তাই!’

রাসাদ ছোট্ট করে জবাব দিল, 'জি।' কিন্তু বুকের ভেতরটা কাঁপা শুরু করল তার। তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, এত সুন্দর করে মিথ্যা কথা বলতে পারে সে। কারণ সে সাধারণত মিথ্যা কথা বলে না। খুব প্রয়োজন হলেও না। বাবা প্রায়ই বলেন, পৃথিবীতে প্রতিদিন যত অন্যায় কাজ হয়, মিথ্যা কথা হচ্ছে তার প্রথম। যদি মিথ্যা কথা না থাকত তাহলে অনেক বড় বড় অন্যায় হতো না এই পৃথিবীতে। কখনোই মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করবে না। দেখবে, সুন্দর এবং ভালোভাবে কেটে যাচ্ছে তোমার সব কিছু।'

কিছুটা অপরাধ বোধে ভুগতে লাগল রাসাদ। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়েই নিচু করে ফেলল মাথা। লোকটা একটু এগিয়ে এলেন। কাঠের টুলের ওপর ফ্লাস্ক আর প্যাকেটটা রেখে বললেন, 'হেড স্যারের সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছ, তা কি বলা যাবে?'

'বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কথাটা প্রথমে স্যারকেই বলতে চাচ্ছি আমি।' মুখটা একটু হাসি হাসি করে বলল রাসাদ।

কাঠের টুলের ওপর থেকে ফ্লাস্ক আর প্যাকেটটা হাতে নিয়ে লোকটি বললেন, 'ঠিক আছে, ভেতরে গিয়ে স্যারকে তোমার কথা বলি। দেখি, স্যার কী বলেন।'

হাতের কনুই দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন সালামত খান। রাসাদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে সে। তার মনে হচ্ছে, একটু শব্দ করলেই এলোমেলো হয়ে যাবে সব কিছু।

দশ-বারো মিনিট পর মুখটা হাসি হাসি করেই রুম থেকে বের হয়ে এলেন সালামত খান। পাশের টুলে বসতে নিয়েই সরে দাঁড়ালেন। রাসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বসো। স্যারকে তোমার কথা বলেছি, পাঁচ মিনিট পর ভেতরে যেতে বলেছেন তোমাকে।'

রাসাদ বসল না। কাঁপুনিটা কমে এসেছিল একটু, আবার শুরু হয়েছে সেটা। গলাটাও শুকিয়ে এসেছে। খটখট করছে ভেতরটা। ব্যাপারটা টের পেলেন সালামত খান। তিনি রাসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ ঘেমে গেছ তো তুমি! পানি খাবে?'

কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে রাসাদ বলল, 'খাব।'

পাশের ছোট রুমে চলে গেলেন সালামত খান। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ এবং কপালটা মুছে নিল রাসাদ। সে বুঝতেই

পারেনি এত ঘেমে গেছে এরই মধ্যে। কিছুটা বিরক্ত হলো সে। যতই ঘাম মুছছে, ততই ঘাম বের হচ্ছে শরীর থেকে। ভয়ও লাগছে একটু একটু। যদি কেউ কিছু টের পেয়ে যায়!

চকচকে কাচের একটা গ্লাসে পানি এনে রাসাদের দিকে এগিয়ে দিলেন সালামত খান। রাসাদ মুখে দিতে নিতেই থামিয়ে দিলেন তিনি তাকে। হাত ধরে কাঠের টুলটাতে বসিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে পানি খেতে নেই। বসে পানি খেতে হয়।'

রাসাদ অবাক হয়ে সালামত খানের দিকে তাকাল। লোকটাকে শিক্ষিত মনে হচ্ছে, যদিও পিয়নরা তেমন শিক্ষিত হয় না। তবু তিনি যে কথাটা বললেন, সেটা তো বাবাও বলেন। কখনো দাঁড়িয়ে পানি খেতে দেখলে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে বলেন, 'বসে পানি খেতে হয়।'

টুলে বসে গ্লাসের সবটুকু পানি এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলল রাসাদ। তাই দেখে সালামত খান বললেন, 'আরো খাবে?'

রাসাদ লাজুক গলায় বলল, 'জি।'

সালামত খান আরো এক গ্লাস পানি এনে দিলেন রাসাদের হাতে। অর্ধেকটুকু শেষ করে হাতেই রেখে দিল সে গ্লাসটা। তারপর বাম দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্কুলের পাশে ওই ফাঁকা জায়গাটা কাদের?'

বাম দিকে এক পলক তাকিয়ে সালামত খান বললেন, 'স্কুলেরই।'

'বিরাট বড় জায়গা।' রাসাদ জায়গাটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'আমি যত দূর জানি, ওই জায়গাটা কোনো জমিদারের ছিল।'

'জি।' সালামত খান মাথাটা একটু নিচু করে বললেন, 'পেছনের দিকে বড় একটা জঙ্গল আছে, ওখানে একটা বাড়িও আছে।'

'বাড়িতে কি কেউ এখানো থাকে?'

'থাকবে কীভাবে, পুরাতন বাড়ি, ছেয়ে ফেলেছে জঙ্গলে। সাপ-বিচ্ছুতে ভরে গেছে। মাঝে মাঝে—।' সালামত খান থেমে গেলেন হঠাৎ। ব্যাপারটা খেয়াল করল রাসাদ, কিন্তু কিছু বলল না। একটু থেমে সালামত খান আবার বললেন, 'জঙ্গলের সামনে ফাঁকা যে জায়গাটা আছে, স্কুলের ছাত্ররা বিকেলে সেখানে খেলাধুলা করে।'

'জায়গাটা কোন জমিদারের ছিল বলতে পারবেন?'

'তা বলতে পারব না। হেড স্যার বলতে পারবেন। তবে ওই জমিদারের কোনো ছেলে-মেয়ে না থাকায় জায়গাটা খালিই পড়ে ছিল

স্কুলের পাশে হওয়ায় এলাকার সবাই কয়েক বছর আগে জায়গাটা স্কুলের জায়গা বলে ঘোষণা দেয়।'

'এই এলাকায় তো আর কোনো খালি জায়গা নেই।'

'খালি জায়গা থাকবে কোথা থেকে। আকাশের সমান বিল্ডিং উঠে গেছে সব খালি জায়গায়। কবুতরের খোপের মতো সব বাসা-বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। ভালো করে রোদ-বাতাস কোনোটাই পাওয়া যায় না এখন এখানে।'

কলিং বেল বেজে উঠল হঠাৎ। সালামত খান সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রাসাদকে হাত দিয়ে ইশারা করে বসতে বলে হেড স্যারের রুমে চলে গেলেন তিনি। একটু পর বের হয়ে এলেন দ্রুত। রাসাদকে বললেন, 'ভেতরে যাও, স্যার তোমাকে ডাকেন।'

টুল থেকে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাসাদ। সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল, পা কাঁপা শুরু হয়ে গেছে তার। আস্তে আস্তে শরীরটাও কেঁপে উঠছে। কিছুটা অসহায়ভাবে সে সালামত খানের দিকে তাকাল। মাথা কাত করে তিনি অভয় দিলেন ভেতরে যাওয়ার জন্য। মৃদু পায়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। দরজায় হাত দেওয়ার আগে সে আবার সালামত খানের দিকে তাকাল। তিনি আগের মতোই ইশারা করলেন মাথা কাত করে।

চার-পাঁচ সেকেন্ড স্থির থেকে দরজাটা খুলে ফেলল রাসাদ। হেড স্যারের রুমে অনেকগুলো মানুষ বসে আছেন। সবাই ঘুরে তাকালেন তার দিকে। রাসাদ সালাম দিয়ে বলল, 'ভেতর আসতে পারি, স্যার?'

বড় টেবিলের ওপাশে লম্বা একটা চেয়ারে বসে আসেন হেড স্যার। হেলান দিয়ে বসে ছিলেন তিনি। সোজা হলেন একটু। রাসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস।'

রুমের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রাসাদ। দু-তিন সেকেন্ড চুপ থেকে কিছুটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'স্যার, আমার নাম রাসাদ, রাসাদ ইশরাক। ঢাকার হলি অ্যাঞ্জেল স্কুলের ক্লাস এইটে পড়ি আমি।'

'তোমার রোল নম্বর কত?' হেড স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

'এক।'

'ভেরি গুড।' হেড স্যার আরো একটু সোজা হয়ে বসলেন, 'আমার সামনে যারা বসে আছেন, তাদের কেউ এই স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্য আর কেউ কেউ বিভিন্ন সাবজেক্টের শিক্ষক। জরুরি একটা মিটিং করছিলাম আমরা, এখনো শেষ হয়নি। তা, তুমি কি কোনো কাজে এসেছ এখানে?'

'জি।'

'কী কাজ, বলো?'

রাসাদ মাথাটা একটুক্ষণের নিচু করে আবার উঁচু করে বলল, 'শুনেছি, এই স্কুলে খুব ভালো লেখাপড়া হয়। আমি একটু জানতে চাই কীভাবে ভালো লেখাপড়া করানো হয় এখানে।'

টেবিলের দিকে ঝুঁকে এলেন হেড স্যার, 'কীভাবে জানতে চাও?'

'কয়েক দিনের জন্য পড়তে চাই আমি এই স্কুলে।'

'ক্লাস এইটেই পড়তে চাও?'

'ঠিক কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসে পড়তে চাই না। আমার যখন যে ক্লাসে বসতে ইচ্ছে হবে আমি তখন সেই ক্লাসে গিয়ে বসব। স্যাররা যা পড়াবেন, তা মনোযোগ দিয়ে শুনব।'

'তোমার তো তাহলে কোনো রোল নম্বর থাকবে না।

'না, আমার রোল নম্বর হবে শূন্য।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'কেউ আমার রোল জিজ্ঞেস করলে বলব — রোল নম্বর শূন্য।'

হেড স্যারের ঠিক সামনে মোটামতো একটা লোক বসে আছেন। কিছুটা কাত হয়ে বসে ছিলেন তিনি। সোজা হলেন। রাসাদের দিকে ঘুরে বসে বললেন, 'রাহাদ — ।'

রাসাদ লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যরি স্যার; রাহাদ না, আমার নাম রাসাদ।'

'রাসাদ।' কপালটা একটু কুঁচকে লোকটা বললেন, 'আমি এই স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি। আমার নাম ফাইজুল রাহিম। তুমি বললে তোমার রোল নম্বর এক। তার মানে তুমি খুব ভালো ছাত্র। ভালো ছাত্রদের বুদ্ধিও খুব ভালো হয়। কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি তোমাকে, দেখি কেমন উত্তর দিতে পারো তুমি।'

মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল রাসাদ। পা কাঁপা শুরু হতে যাচ্ছিল, কোনোরকমে থামাল সেটা। গলাটাও শুকিয়ে যাচ্ছে। পানি খাওয়া দরকার, কিন্তু লজ্জা লাগছে পানি চাইতে।

ফাইজুর রাহিম সাহেব আরো একটু ঘুরে বসে বললেন, 'তা তুমি প্রস্তুত তো রাহাদ?'

'স্যরি স্যার; রাহাদ না, রাসাদ।'

'দুঃখিত, নাম ভুলে যাওয়ার একটা স্বভাব আছে আমার। তোমার নাম হচ্ছে রাসাদ — র আকার স আকার আর দ।'

'জি।'

'তাহলে তুমি প্রস্তুত?'

'জি।' রাসাদ বুঝতে পারল লোকটা আসলে কী প্রশ্ন করবেন তা খোঁজার চেষ্টা করছেন। ভালো কোনো প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। হঠাৎ কিছুটা উত্তেজনার ভঙ্গি নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বলো তো, কোন জিনিস অপরিষ্কার থাকলে সাদা দেখা যায়, পরিষ্কার থাকলে কালো দেখায়?'

মুচকি হাসল রাসাদ, 'এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন হলো, স্যার।'

'সহজ!'

'শুধু সহজ না, খুব সহজ।'

'ঠিক আছে, খুব সহজ প্রশ্নটারই উত্তর দাও তো দেখি।'

'ব্ল্যাকবোর্ড।'

চোখ দুটো সামান্য ছোট করে ফাইজুর রাহিম সাহেব বললেন, 'তুমি বললে খুব সহজ প্রশ্ন, অথচ তোমার বয়সী আরো তিনজনকে এই একই প্রশ্ন করেছিলাম আমি। পারে নাই। আমার এক নাতি আছে, এই স্কুলে পড়ে, সেও পারেনি।' ফাইজুর রাহিম সাহেব রাসাদের দিকে ভালো করে তাকালেন। আরো একটা প্রশ্ন ভাবছেন তিনি। হঠাৎ বললেন, 'বলো তো, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব থেকে আমরা কী শিখেছি?'

'সব সময় ক্লাসে বসে না থেকে মাঝে মাঝে গাছতলায় বসে থাকা দরকার।' চেহারাটা খুব গম্ভীর করে বলল রাসাদ।

চোখ বড় বড় করে ফেলেছেন ফাইজুর রাহিম সাহেব। রাসাদ সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'স্যার, নিউটন যদি আপেল গাছের নিচে বসে না থেকে ক্লাসে বসে থাকতেন, তাহলে কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারতেন?'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'স্যার, নিউটন কিন্তু মাত্র তিনটা সূত্রের কথা বলে গেছেন আমাদের। তিনি যদি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে আরো অনেক সূত্রের কথা বলে যেতে পারতেন।'

কিছুটা আগ্রহ নিয়ে ফাইজুর রাহিম সাহেব বললেন, 'যেমন?'

'যেমন লাইনের সূত্র — যখন আপনি তাড়াতাড়ি কোথাও যাওয়ার জন্য একটা লাইন ছেড়ে অন্য লাইনে দাঁড়াবেন, তখন আপনার ছেড়ে আসা লাইনটা আপনি পরে যে লাইনে দাঁড়িয়েছেন তার চেয়ে দ্রুত এগোতে থাকবে। টেলিফোনের সূত্র — যখন আপনি কোনো রং নাম্বারে ফোন করবেন তখন কোনো এনগেজড টোন শুনতে পাবেন না। কাজের সূত্র — কাজ করতে করতে যখন দুই হাত একদম কালিঝুলিতে ভরে যাবে, ঠিক তখনই নাকের ডগাটা চুলকাতে থাকবে আপনার। বাথরুম

সূত্র—বাথরুমের দুটো সূত্র দিতে পারতেন। ১ম সূত্র পানি ঢেলে সারা শরীর এবং চুল একদম ভিজিয়ে ফেলার পরপরই ফোনটা বেজে উঠবে। ২য় সূত্রটা হচ্ছে সারা শরীরের সাবান মাখার পর কিংবা চুলে শ্যাম্পু মাখার পরপরই ট্যাপের পানি বন্ধ হয়ে যাবে।' রাসাদ থেমে ফাইজুর রাহিমের দিকে তাকাল, 'আরো বলব স্যার?'

'বলো, শুনতে খুব মজা লাগছে।'

'মজা হলেও ব্যাপারটা তো সত্য।'

'একদম সত্য।'

'চুলকানির সূত্র—শরীরের সেই স্থানের চুলকানি সব সময় বেশি তীব্র হয়, যে স্থানে হাত পৌঁছানো বেশ কঠিন। কেনাকাটার সূত্র—দোকান থেকে কোনো কিছু কিনে খুশিমনে ফিরতে গেলে দেখবেন অন্য একটা দোকানে একই জিনিস আরো কম দামে বিক্রি হচ্ছে। খুঁজে পাওয়ার সূত্র—শপিং শেষে বাসায় যাওয়ার পথে যে চকোলেটটা আপনি খাবেন বলে ভাববেন, সেটাই বাজারের ব্যাগের সবচেয়ে নিচে থাকবে। টিভির সূত্র—সারা দিনের কাজ শেষে যখন আরাম করে একটু টিভি দেখার জন্য বসবেন তখন সব চ্যানেল বেছে বেছে সবচেয়ে জঘন্য আর বিরক্তিকর অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করবে। চুল আঁচড়ানোর সূত্র—যেদিন খুব যত্ন করে, সময় নিয়ে চুল আঁচড়ে বাইরে বেরুবেন, সেদিনই দমকা বাতাস বইবে; না হয় হঠাৎ নামা বৃষ্টি আপনাকে ভিজিয়ে দেবে।' রাসাদ থেমে গেল আবার।

'তোমার বলা শেষ?' হেড স্যার মুখটা হাসি হাসি করে বললেন।

'না স্যার, আরো কয়েকটা আছে।'

'বলো, শুনতে বেশ ভালো লাগছে।'

'দরকারের সূত্র—বছরের পর বছর পড়ে আছে বলে কোনো জিনিস ফেলে দিলে দেখবেন ঠিক পরের সপ্তাহেই জিনিসটা আপনার দরকার হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সূত্র—শরীর খারাপ লাগার সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যান, চেম্বারে পৌঁছার সাথে সাথে ডাক্তার দেখানোর আগেই শরীরটা ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু না গিয়ে ঘরে বসে থাকুন, কিছুতেই শরীর ভালো হবে না আপনার।'

'তোমার আসলেই অনেক বুদ্ধি।' ফাইজুর রাহিম সাহেব ভালো করে রাসাদের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা, একটা বুদ্ধি দাও তো দেখি।'

'জি, বলুন।'

'স্কুলের ফান্ড কালেক্ট করার জন্য আমরা একটা অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি কয়েক দিন পর। সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কীভাবে সবচেয়ে বেশি

ফান্ড কালেক্ট করতে পারব?' ফাইজুর রাহিম সাহেব আগ্রহ নিয়ে তাকালেন রাসাদের দিকে।

'অনুষ্ঠানের প্রবেশ মূল্য ফ্রি করে দিতে হবে।'

'মানে!' ফাইজুর রাহিম সাহেব ঝট করে মাথা সোজা করলেন, 'প্রবেশ মূল্য ফ্রি হলে ফান্ড কালেক্ট হবে কীভাবে!'

'প্রবেশ মূল্য ফ্রি হলে অনেক মানুষ অনুষ্ঠানে আসবে। সবাই যখন হল রুমে ঢুকবে তখন দরজাটা বন্ধ করে দেব আমরা। অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন যার যার বাসায় যেতে চাইবে, তখন বলা হবে—এখানে থেকে বের হওয়ার মূল্য এক শ' টাকা। সবাই বাসায় যেতে চাইবে, বদ্ধ ঘরে কেউ থাকতে চাইবে না। কেউ আর তখন এক শ' টাকা দিতে মন খারাপ করবে না।' চকচক করছে রাসাদের চোখ দুটো।

'এটা তো দুষ্টু বুদ্ধি হলো!' ফাইজুর রাহিম সাহেব শব্দ করে হাসতে হাসতে বললেন।

'স্যার, প্রতিটা বুদ্ধিতেই কিছু না কিছু দুষ্টুমি থাকে।' বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল রাসাদ।

'তুমি আরেকটা বুদ্ধির কথা বলো তো—মৃত্যুর পর সবাই চায় অন্তত কিছু মানুষ তাকে মনে রাখুক। এটা কীভাবে সম্ভব?' ফাইজুর রাহিম সাহেব আগের মতোই আগ্রহ নিয়ে তাকালেন রাসাদের দিকে।

'স্যার—।' কপালে ঘাম জমে উঠছে আবার রাসাদের। সেগুলো বড় হওয়ার আগেই হাত দিয়ে মুছতে মুছতে সে বলল, 'মৃত্যুর পর—এই কথাটা আসলে ঠিক না। কথাটা হবে জীবনের পর। জীবনের পর আসে মৃত্যু, মৃত্যুর পর সব কিছু সীমাহীন।'

'ভেরি গুড। খুব সুন্দর কথা। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কথাটা তোমার না। তোমার বয়স কম, এ ধরনের কথা তোমার মাথায় আসার কথা না।' হেড স্যার বললেন।

'আপনি ঠিক বলেছেন স্যার।' রাসাদ কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আমার বাবার কাছে শুনেছি কথাটা। বাবা মাঝে মাঝেই সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। মন ভরে যায় আমাদের।'

ফাইজুর রাহিম সাহেব শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তাহলে তোমার কথা অনুযায়ীই বলো—জীবনের পর মানুষের মাঝে কীভাবে নিজেকে মনে রাখানো যায়।'

'এটাও খুব সহজ স্যার। মৃত্যুর কিছুদিন আগে যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নিন। দেখবেন, আপনাকে সবাই মনে রাখছে, অনেক দিন মনে রাখছে।'

'এটা কেমন বুদ্ধি হলো!'

'দুষ্টু বুদ্ধি।' রাসাদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'ওই যে বললাম না স্যার, সব বুদ্ধির মাঝেই কিছুটা দুষ্টুমি থাকে।'

'তুমি কয়দিন এই স্কুলে পড়তে চাচ্ছ, ভালো। কিন্তু বড় ধরনের দুষ্টুমি করে কোনো ক্ষতি করবে না তো আমাদের!' হেড স্যার চেয়ারটা আরো একটু পেছনে ঠেলে বললেন, 'তোমাকে বিশ্বাস করব কীভাবে আমরা!'

'বিশ্বাস আসলে অন্য রকম জিনিস স্যার।' রাসাদ মাথা চুলকাতেই চুলকাতেই বলল, 'বিশ্বাসের ইংরেজি হচ্ছে Believe। এই Believe-এর মাঝেই কিন্তু lie লাই লুকিয়ে আছে, যার মানে মিথ্যা।'

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন রাসাদের দিকে। আবার ঘামতে শুরু করেছে সে। এতক্ষণ সে যা বলেছে, তার সবগুলোই মিথ্যা বলেছে সে। দুর্দান্ত একটা কাজ করতে সে এই স্কুলে এসেছে। আপাতত কাউকে বলা যাবে না সেটা। খুব গোপনভাবে কাজটা করতে হবে তার। কেউ টের পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে স্কুলের, স্কুলের সব ছাত্রের!

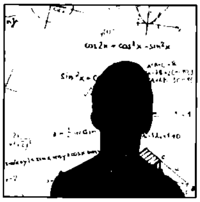

সাদা ছোট কাগজটাতে নামগুলো লিখে রাসাদকে দিল সাতিল। ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রেখেই হাত বাড়াল রাসাদ। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ইন্টারনেটে কী যেন খুঁজছিল সে। কাগজটা হাতে নিয়ে রেখে দিল পাশে। বেশ কিছুক্ষণ পর ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে সাতিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মজার কিছু জিনিস খুঁজছিলাম ইন্টারনেটে।'

'পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, অনেকগুলো পেয়েছি।' পাশ থেকে ছোট্ট কাগজটা হাতে নিয়ে সেটার দিকে তাকাল রাসাদ, 'এই পাঁচজন?'

'হ্যাঁ, এই পাঁচজন।'

নামগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রাসাদ। পাশে বসা সাতিল বেশ উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'কিছু একটা করতে পারবে তো মামা?'

সাতিলের দিকে ঘুরে বসল রাসাদ। কিছুটা গভীর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর কী মনে হয়?'

ঝট করে দু'হাত দিয়ে রাসাদের একটা হাত চেপে ধরল সাতিল, 'ছোট মামা, তুমি অবশ্যই পারবে। তুমি ছাড়া এ কাজ কেউ পারবে না, কোনো দিন পারবে না।'

'কী রে, তোর চোখ তো বঙ্গোপসাগর হয়ে যাচ্ছে! টলটল করছে! গড়িয়ে পড়বে এখনই।' রাসাদ কিছুটা হেসে বলল, 'আচ্ছা, এমনি এমনি কাঁদছিস কেন তুই বল তো!'

'কষ্টে।'

সাতিলের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে রাসাদ বলল, 'তাই তো অনেক কাজ বাদ দিয়ে, অনেক পরিকল্পনা বাতিল করে, লেখাপড়া কমপ্লিট না করে, তোর কথামতো এখানে এসেছি। প্রথমে তো ভেবেছিলাম কী না কী কঠিন কাজ, কী ঝামেলা!'

'তোমাকে যা যা বলা হয়েছে সেগুলো কঠিন কাজ না!'

'মোটেই না।' রাসাদ চোখ দুটোতে দুষ্টুমি এনে বলল, 'তবে বুদ্ধির কাজ। প্রচুর বুদ্ধি খাটাতে হবে এখানে।'

'আমি জানি মামা। সেই বুদ্ধিও তোমার আছে।'

'তুই সত্যি জানিস?'

'এক শ'তে এক শ' দশ পার্সেন্ট জানি।'

'আমাদের স্কুলে তো সামার ভ্যাকেশন শুরু হয়ে গেছে তিন দিন আগে থেকে। তোদের স্কুলে কবে থেকে শুরু?' সাতিলকে জিজ্ঞেস করল রাসাদ।

'গত দু'বছর স্কুলের রেজাল্ট একটু খারাপ হওয়ায় অনেক ছুটি বন্ধ করে দিয়েছেন হেড স্যার। খুব টাইটের মধ্যে চলছে স্কুল। লেখাপড়ার একটু ফাঁকি দেখলেই হেড স্যার একেবারে আগুন হয়ে যান।' সাতিল একটু থেমে বলল, 'স্যাররাও রেহাই পাচ্ছেন না। চার-পাঁচ দিন আগে আমাদের ইংরেজির স্যারকে প্রায় চাকরিচ্যুত করেছিলেন হেড স্যার। ক্লাস নাইনে পড়াতে গিয়ে কী নাকি একটা ভুল করেছিলেন স্যার।'

'তুই তো ক্লাস সিক্সে।'

'জি মামা।'

'সামার ভ্যাকেশন চললেও অনেক পড়া শেষ করতে হবে আমার। কিছু শেষ করেছি, কিছু বাকি আছে। জেএসসিতে ভালো করতে না পারলে খুব মুশকিল হয়ে যাবে।'

'তুমি তো সব সময় ভালো করো ক্লাসে।'

'তা করি।'

'জেএসসিতেও ভালো করবে তুমি।'

রাসাদ একটু চুপ থেকে সোজা হয়ে বসল। হাতের কাগজটার দিকে আরো একবার তাকিয়ে বলল, 'ফ্রিজে আমের জুস আছে না, একটু নিয়ে আয় তো। খেতে খেতে পরের কাজগুলো সেরে ফেলি।'

ফ্রিজ থেকে দ্রুত এক গ্লাস জুস এনে সাতিল রাসাদের হাতে দিল। রাসাদ গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল, 'তুই খাবি না।'

'আমার মুড নেই মামা। টেনশনে কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'টেনশনের কী হলো!'

'মামা—।' চোখ আবার ছলছল করে ফেলল সাতিল, 'জিনিসটা রক্ষা করতে না পারলে অনেক ক্ষতি হয় যাবে আমাদের। শুধু আমাদের না,

আশপাশের সব ছেলে-মেয়েদের। তাছাড়া নতুন একটা ক্রিকেট টিম করেছি আমরা। প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা দরকার আমাদের। যদি ঠিকমতো— ।'

সাতিলের আম্মু ঢুকলেন রুমে। হাতে একটা ট্রে। ওদের সামনে রেখে বললেন, 'কাল থেকে দেখছি সারাক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলছিস তোরা। কী হয়েছে বল তো!'

ট্রে থেকে নুডলসের একটা বাটি হাতে নিয়ে রাসাদ বলল, 'বলতে পারো জটিল একটা সমস্যায় পড়েছে ওরা। ঠিক পড়েনি, পড়তে যাচ্ছে। শুধু ওরা না, এলাকার সব ছেলে-মেয়েই সমস্যায় পড়বে।'

'সমস্যাটা কী?'

মুখে নুডলস দিয়ে রাসাদ বলল, 'আপাতত বলা যাবে না আপু।'

'নিশ্চয় কঠিন কোনো সমস্যা! না হলে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এখানে আসিস তুই! আর সমস্যাটা সাতিলের কিংবা সাতিলদের বলেই তোর এত আগ্রহ। আমার বা তোর দুলাভাইয়ের কোনো সমস্যা শুনলে তুই কানেই তুলতিস না।'

'তা ঠিক।' হাত দিয়ে সাতিলকে কাছে টানল রাসাদ। কিছুটা ঠেসে ধরল নিজের শরীরের সঙ্গে। সাতিলের আম্মু ট্রেটা রেখেই চলে গেলেন আবার।

নুডলস শেষ করে জুসের গ্লাসে চুমক দিয়ে হাতের কাগজটার দিকে তাকাল রাসাদ, 'তুই এখানে পাঁচটা নাম লিখেছিস। তার প্রথম নামটা হচ্ছে সাদমান। এই সাদমান সম্বন্ধে তুই যা যা জানিস, তার সবগুলো বল আমাকে। তারপর অন্য চারজন সম্বন্ধে বলবি।'

দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে খাটে বসেছিল সাতিল। দ্রুত খাট থেকে নামল সে। সঙ্গে সঙ্গে রাসাদ বলল, 'খাট থেকে নামলি কেন তুই!'

'খাটে বসে সব কিছু ভালো করে বলতে পারব না আমি। মেঝেতে দাঁড়িয়ে বলি।' ভাষণ দেওয়ার মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল সাতিল মেঝেতে।

'ওকে।' গ্লাসে আরেকবার চুমক দিল রাসাদ, 'তোর যেভাবে বলতে ভালো লাগে, বল।'

সাতিল কিছু একটা বলতে নিয়েই থেমে গেল। তোতলাতে শুরু করল কিছুটা। রাসাদ কপাল কুঁচকিয়ে বলল, 'তোতলাচ্ছিস কেন?'

মাথা নিচু করে ফেলল সাতিল, 'স্যরি।' তারপর মাথা আবার উঁচু করে বলল, 'সাদমান ভাইয়ার পুরো নাম হচ্ছে সাদমান সাকিব। ক্লাস এইটে পড়েন তিনি। রোল নম্বর তিন।'

'এটুকুই!'

'আর কী বলব?'

'আর কিছু জানিস না ওর সম্বন্ধে?'

'জানি তো।' সাতিল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'কিন্তু এ মুহূর্তে মনে আসছে না কিছু।' সাতিল হঠাৎ কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'মামা, তুমি বরং প্রশ্ন করো, আমি তার উত্তর দিচ্ছি।'

'ছেলেটা দেখতে কেমন?' সাতিলকে জিজ্ঞেস করল রাসাদ।

'ভালুকের মতো।'

'কী!' কিছুটা শব্দ করে বলল রাসাদ।

'বললাম তো ভালুকের মতো। ওর মাথার চুল ভীষণ কোঁকড়ানো আর ঘন। কিছুটা লম্বা বলেও স্কুলের সবাই ওকে ভালুক বলে ডাকে। এতে অবশ্য সাদমান ভাইয়া কিছু মনে করেন না। বরং খুশিই হন। হাসি হাসি মুখেই সবার কথার উত্তর দেন।'

'ওর চোখে কী চশমা আছে?'

'না।' সাতিল একটু ভেবে বলল, 'তবে ফারাব ভাইয়ার চোখে চশমা আছে। খুব পাওয়ারওয়ালা চশ— ।'

'তোকে তো ফারাবের কথা জিজ্ঞেস করিনি।' সাতিলকে থামিয়ে দিয়ে রাসাদ বলল, 'সাদমানের একটা শখের কথা বল?'

'ম্যাজিক খুব ভালোবাসেন সাদমান ভাইয়া। তার বাসায় ম্যাজিক দেখানোর অনেক জিনিসপত্র আছে।'

'তাই!'

'সাদমান ভাইয়া ভালো একজন মানুষও।'

'কী করে বুঝলি সাদমান একজন ভালো মানুষ?'

'সাদমান ভাইয়া প্রতিদিন স্কুলে যে টিফিন নিয়ে আসেন, তা তিনি একা খান না। কারো না কারো সঙ্গে ভাগ করে খান তিনি। বিশেষ করে ওনার ক্লাসে একজন ছাত্র আছেন, শফিক ভাইয়া নাম। বেশ গরিব তিনি। টিফিন

আনতে পারেন না স্কুলে। টিফিন খাওয়ার সময় শফিক ভাইয়াকে সঙ্গে করে খান তিনি।' দুঃখী দুঃখী গলায় বলল সাতিল।

'এই স্কুলে তো অনেক টাকা বেতন। শফিক গরিব হলে বেতন দেয় কীভাবে?' রাসাদ খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের স্কুলে প্রতি ক্লাসে পাঁচজন মেধাবী ছেলেকে ফ্রি পড়ানো হয়।'

'শফিক কি খুব ভালো ছাত্র?'

'খুব ভালো ছাত্র। ওনার রোল নম্বর দুই।' সাতিল কিছুটা উৎসাহী হয়ে বলল, 'সাদমান ভাইয়ার আরো একটা ভালো অভ্যাস কি জানো—আমাদের স্কুলে যে গরিব ছাত্রগুলো পড়ে উনি মাঝে মাঝেই তাদের কলম, খাতা গিফট করেন। ব্যাপারটা দেখলে কী যে ভালো লাগে আমার!'

'ভালোলাগার মতোই তো ব্যাপার।'

'সাদমান ভাইয়ার একটা ল্যাপটপ আছে। শুনেছি, সেটা নাকি প্রত্যেকটা গরিব ছাত্রকে এক সপ্তাহের জন্য ব্যবহার করতে দেবেন।'

'সাদমানের কথা শুনে ভালো লাগল।' নাম লেখা হাতের কাগজটার দিকে তাকাল রাসাদ, 'দ্বিতীয় যে নামটি লিখেছিস সেটা হলো টমাস।' কাগজটা থেকে চোখ সরিয়ে সাতিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুরো নাম টমাস আলভা এডিসন নাকি ওর। ওই যে বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না! বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেছেন।'

'না। ওর পুরো নাম টমাস মরিসন। সবাই তাকে ডাকে টমটম বলে।'

'কেন?'

'ঘোড়ার গাড়িকে তো টমটম গাড়ি বলে। সব গাড়ির ব্রেক আছে, কিন্তু টমটমের কোনো ব্রেক নেই। টমাসেরও কোনো ব্রেক নেই। আমাদের স্কুলে যে ক্রিকেট টিম আছে, সেটার ক্যাপটেন ও। এত জোরে বোলিং করে—বল ছোড়ার পর ব্রেক ছাড়া গাড়ির মতো ছুটতে থাকে সেটা স্টাম্পের দিকে। ব্যাটসম্যান হিসেবেও অসাধারণ। এ পর্যন্ত তিনবার আমাদের স্কুল-টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। ফুটবলও ভালো খেলে ও। হেড দিয়ে যা গোল করে!'

'খুবই ভালো কথা।'

'ওর এই গুণের জন্য স্কুলে ওর বেতন অর্ধেক। যেখানে আমরা বেতন দেই সাত শ' টাকা, ওর সাড়ে তিন শ' টাকা। আমাদের হেড স্যারই এটা করেছেন। অবশ্য মাথায় বুদ্ধি একটু কম।'

'বুদ্ধি কম কী করে বুঝলি?'

'অঙ্ক একদম পারেন না। কোনোরকমে পাস করেন পরীক্ষায়। সবাই বলে, হেড দিয়ে গোল করতে করতে নাকি মাথায় বুদ্ধি কমে গেছে ওনার।'

'কোন ক্লাসে পড়ে টমাস?'

'ক্লাস সেভেনে।'

'তিন নম্বর নামটা হলো জহির।' রাসাদ কাগজটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুরো নাম নিশ্চয় জহির আব্বাস?'

'একদম ঠিক বলেছ মামা!' সাতিল বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'পুরো নাম তুমি জানলে কী করে?'

'জহির নামটা দেখেই মনে হলো পরের অংশটুকু আব্বাস হবে।'

'আমাদের বাসার এক বাসা পরেই তাদের বাসা। সবাই বলে, স্কুলের সবচেয়ে ট্যালেন্ট ছেলে নাকি তিনি। ক্লাস এইটের সব ছাত্রের মাথায় যতটুকু না বুদ্ধি আছে, তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে জহির ভাইয়ার একার মাথাতেই।'

'জহিরের কয়েকটা বুদ্ধির নমুনা দে তো।'

'কয়েক মাস আগে এক রাতে স্কুলের নারকেল গাছ থেকে বেশ কয়েকটা নারকেল চুরি হয়ে যায়। হেড স্যার তো নাইটগার্ডের ওপর মহাখেপা। বেচারার চাকরি যায় যায়। শেষে জহির ভাইয়া বুদ্ধি করে নারকেল চোর বের করেন। আমাদের স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি আছেন না, তার এক আত্মীয় চুরি করেছিল নারকেলগুলো। আমাদের পাড়ার এক বাসার কাজের ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল কয়দিন আগে। এই জহির ভাইয়াই খুঁজে বের করেছিল তাকে। জহির ভাইয়ার একটা ভালো অভ্যাস কি জানো? সারাক্ষণ বই পড়েন তিনি। তবে যেই-সেই বই না, গোয়েন্দা কাহিনীর বই পড়েন বেশি। একটা খারাপ অভ্যাসও আছে তার।'

'খারাপ অভ্যাস! সেটা কী?'

'উনি কথা বলেন খুব কম। কেউ কোনো প্রশ্ন না করলে সহজে তার উত্তর দেন না। অনেকে অবশ্য তাকে অহঙ্কারীও বলে।'

'কথা কম বললেই কেউ অহঙ্কারী হয়ে যায় না। যাক গে—।' কাগজটার দিকে আবার তাকাল রাসাদ, 'চার নম্বর নামটা হচ্ছে আরাফ—।' রাসাদ সাতিলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু আগে চশমাওয়ালা যে আরাফের কথা বলছিলি, সেই আরাফ, না?'

'হ্যাঁ। পুরো নাম আরাফ হাসান।'

'কোন ক্লাসে পড়ে?'

'ক্লাস সেভেনে।'

'যারা চশমা পরে তাদের বোকা বোকা দেখালেও বেশ চালাক হয় তারা।' রাসাদ সাতিলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'আরাফ কি খুব চালাক?'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সাতিল। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছে ও। বেশ কিছুক্ষণ পর ফোস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না মামা।'

'ওর কোনো পছন্দ জানা আছে তোর?'

'কম্পিউটার খুব পছন্দ করেন আরাফ ভাইয়া। শুনেছি, বাসায় তিনি যতক্ষণ না লেখাপড়া করেন তার চেয়ে বেশি কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। একটু দুষ্টুও।'

'দুষ্টু?' রাসাদ নিজের দু' ঠোঁট পরস্পর চেপে ধরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সাতিলের দিকে। কী যেন ভাবছে গভীরভাবে। মাথার চুলে হাত দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে ফেলল সে। তারপর সোজা হয়ে বসে হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শেষ এবং পাঁচ নম্বর নামটা হচ্ছে পলাশ।'

'সবাই ডাকে মোটকু পলাশ।'

'মোটকু পলাশ মানে!'

'পলাশ এত মোটা যে, আমাদের স্কুলের এক বেঞ্চে সাধারণ পাঁচজন বসে, পলাশ যে বেঞ্চে বসে, সেটাতে চারজন বসতে পারে।'

'বলিস কী! এত মোটা!'

'পলাশের যে জিনিসটা দেখার মতো, তা হলো—ওর খাওয়া। ও একসঙ্গে চার-পাঁচটা সিঙ্গারা খেতে পারে। ছয়-সাতটা সমুচা তো ওর কাছে কোনো ব্যাপারই না। আমাদের স্কুলের সামনে যে ফাস্টফুডের দোকানটা আছে, ওখানে বেশ বড় বড় বার্গার পাওয়া যায়। পলাশ প্রায় চার কামড়ে একটা বার্গার শেষ করে ফেলে। খেতে খুব পছন্দ করে ও।'

'কোন ক্লাসে পড়ে ও।'

'আমাদের সঙ্গে পড়ে।'

'ক্লাস সিক্সের একটা ছেলে যদি এমন মোটা হয় তাহলে তো ভীষণ মুশকিল।' রাসাদ বিছানায় কাত হয়ে ছিল, সোজা হলো সে, 'রোল কত ওর?'

'তেইশ।'

'তার মানে মোটামুটি মানের ছাত্র ও।'

'ক্লাস ফাইভের ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় তিনটা সাবজেক্টে ফেইল করেছিল ও। কিন্তু ওর বাবা অনেক ক্ষমতাশালী একজন। পরে অবশ্য বেশ কয়েকটা টিচার রেখে ওই সাবজেক্টগুলোতে মোটামুটি রেজাল্ট করানো হয়েছিল।'

রাসাদ হাতের কাগজটার দিকে আবার তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সাতিলকে বলল, 'আমি আরো কিছু জানতে চাই। তোকে যখন যে প্রশ্নগুলো করব, তা জেনে আমাকে জানাবি। আরো একটা কথা— ।' ল্যাপটপে নামগুলো লিখতে লিখতে রাসাদ বলল, 'তোদের স্কুলে সবচেয়ে রাগী স্যার কে?'

'ভূগোল স্যার।'

'ভালো স্যার?'

'অঙ্ক স্যার।'

'কার সঙ্গে তোর সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক?'

'অঙ্ক স্যারের।' সাতিল একটু থেমে বলল, 'শুধু আমার না, স্কুলের সব ছাত্রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। স্যারের বয়স কিন্তু বেশি না। তিনি কিন্তু প্রায়ই আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন।'

'বলিস কী! তাহলে তো সবার প্রিয় হওয়ারই কথা।'

'স্যারের সঙ্গে স্কুল কমিটির একটা দ্বন্দ্ব চলছে।'

'কেন!'

'স্যার আমাদের পক্ষ নিয়েছেন বলে।'

'তুই আমাকে যে ব্যাপারে এখানে ডেকে এনেছিস সেই ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'অঙ্ক স্যারের তো তাহলে সমস্যা হবে!'

'আমরাও তাই ভাবছি।' সাতিল মাথা নিচু করে বলল, 'কিন্তু অঙ্ক স্যার হাসতে হাসতে বলেন, সমস্যাকে সমস্যা ভাবা ঠিক না। সব সমস্যারই নাকি কোনো না কোনো সমাধান আছে।'

রাসাদ দু' সেকেন্ড ভেবে বলল, 'একদম ঠিক বলেছেন স্যার। সব সমস্যার একটা সমাধান আছে। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, অনেকেই জানে না সেই সমাধানটা কত মজার, কত আনন্দের।'

'তুমি ঠিক বলছ মামা?' সাতিল আবার রাসাদের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি খুব আশা নিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, যা করতে হবে তা দ্রুত করতে হবে। আমার ভীষণ ভয় ভয় করছে মামা। একটা কিছু তোমাকে করতেই হবে, করতেই হবে।'

হেসে ফেলল রাসাদ। কিন্তু একমাত্র ভাগিনার মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। চোখ ভিজিয়ে ফেলেছে সে। রাসাদ টের পেল, তার চোখও ভিজে উঠছে। আলতো করে সাতিলের মাথাটা কাছে এনে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল সে।

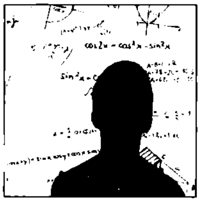

সাতিলের আম্মু দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন, 'ঘুম থেকে ওঠ তো বাবা। দেখ তো, আমাদের বাসার পেছনের রাস্তার এক বাসায় কী যেন হয়েছে! অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে সেখানে।'

ঝট করে বিছানায় উঠে বসল সাতিল। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'পেছনে কাদের বাসা, নীতুদের বাসাতে?'

'না, ওদের পাশের বাসাতে!'

'ওই বাসার সবাই তো কয়দিন আগে বিদেশে চলে গেছে। বছরে একবার ওই বাসার সবাই এক-দেড় মাসের জন্য বিদেশে বেড়াতে যান। তিন-চারটা কাজের লোক আছে, তারা তখন থাকে বাসায়। কালকেও একটা কাজের লোকের সঙ্গে কথা হলো আমার।'

'সেটা তো কালকে। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়েছে সকাল থেকে। ওই বাসার শব্দেই তো ঘুম ভেঙে গেল আমার।' কপালে ঘাম জমেছে সাতিলের আম্মুর। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'প্রথমে তো বুঝতে পারিনি কোন বাসা থেকে শব্দ আসছে। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর পর বুঝতে পারলাম সব কিছু।'

ঝট করে পাশে তাকাল সাতিল, 'ছোট মামা কই?'

'রাসাদ সম্ভবত বাথরুমে।' আশপাশ দেখে বাথরুমের দরজার দিকে তাকালেন সাতিলের আম্মু।

'ছোট মামার সম্ভবত রাতে ভালো ঘুম হয়নি।'

'কেন!'

'তা তো জানি না। রাতে একবার ঘুম ভেঙে যায় আমার। দেখি, পায়চারি করছেন মামা মেঝেতে। মাঝে মাঝে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থেকেছেন আকাশের দিকে।'

'তুই কিছু জিজ্ঞেস করিসনি?'

'না।' সাতিল কিছুটা অপরাধী গলায় বলল, 'মামাকে বোধহয় টেনশনে ফেলে দিয়েছি আমি।'

'কী করেছিস আমি তো কিছু জানি না। ও কিন্তু তোর চেয়ে মাত্র আড়াই বছরের বড়। তোর মতোই এখনো ছোট আছে ও। বেশি টেনশনে থাকলে মাথা না শেষে বিগড়ে যায়!'

'এখন তো আমারই টেনশন হচ্ছে আম্মু।' সাতিল চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, 'ওই যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, ওই বাসা থেকেই নাকি?'

জানালার দিকে একপলক তাকিয়ে সাতিলের আম্মু বললেন, 'হ্যাঁ।'

বাথরুমের দরজা খুলে রাসাদ বের হয়ে এলো। বারান্দা থেকে টাওয়েলটা এনে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'তোমাদের বাসায় মাঝে মাঝে কোনো কিছু চুরি হয় নাকি, আপু?'

'হয় তো।' সাতিলের আম্মু কিছুটা উদগ্রীব হয়ে বললেন, 'এই তো সেদিন ছাদ থেকে একটা বালতি চুরি হয়ে গেছে।'

'প্লাস্টিকের বালতি?'

'হ্যাঁ। কাজের মেয়েটা কাপড়-চোপড় ধুয়ে বালতিতে করে নিয়ে গিয়ে শুকাতে গিয়েছিল ছাদে। পরে আনতে ভুলে গিয়েছিল সেটা। সকালে গিয়ে দেখে বালতি নেই।'

'ছোটখাটো আর কিছু?'

সাতিলের আম্মু একটু ভেবে বলল, 'এ পর্যন্ত একটি মাছ কাটার দা; সাতিলের একটা ক্রিকেট সেট; তোর দুলাভাইয়ের একটা প্যান্ট; বাসার কিছু কাজের জন্য কিছু কাঠ কিনে এনে রাখা হয়েছিল ছাদে, তার কয়েকটা; এ রকম অনেক কিছু চুরি হয়ে গেছে।' সাতিলের আম্মু একটু থেমে বললেন, 'কয়দিন আগে বেশ গরম পড়েছিল, জানালা খুলে ঘুমিয়েছিলাম। ওখানে টিভির রিমোট আর তোর দুলাভাইয়ের পুরাতন মোবাইল সেটটা ছিল, সকালে উঠে দেখি সেই দুটো নেই।'

'মামা—।' সাতিল বিছানা থেকে নেমে রাসাদের পাশে এসে বলল, 'আমরা থাকি তিনতলায়। আমার মাথায় আসে না এই এত উঁচুতে চুরি হয় কীভাবে, চুরিটা করেইবা কে?'

'চুরি অবশ্যই একজন চোর করে।' রাসাদ হাসতে থাকে, 'এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। আর যারা চুরি করে তারা উঁচু-নিচু সব জায়গা থেকেই চুরি করতে পারে।' রাসাদ সাতিলের আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল রাতেও চোর এসেছিল।'

'বলিস কী?' সাতিলের আম্মু রাসাদের একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'তুই দেখেছিস নাকি?'

'শুধু দেখিনি, কথাও হয়েছে।'

'কী!'

'এমনিতেই ঘুম আসছিল না। হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হয় বাইরে। কিছুটা চমকে উঠি আমি।' রাসাদ মুখটা হাসি হাসি করে বলে, 'টের পাই, জানালার পাশ থেকেই শব্দটা এসেছে।'

জানালার দিকে তাকান সাতিলের আম্মু, 'জানালা খোলা ছিল নাকি রাতে?'

'ভ্যাপসা একটা গরম পড়েছে না, তাই খোলা রেখেছিলাম।' রাসাদ খাটের পাশে বসে বলল, 'কোনোরকম শব্দ না করে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াই আমি। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, জানালার গ্রিল ধরে একটা লোক তাকিয়ে আছে ঘরের ভেতর।'

সাতিলের আম্মু প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে রাসাদের পাশে এসে বসলেন। ওর একটা হাত খামচে ধরে বললেন, 'তারপর?'

'জানালার পাশ থেকে দ্রুত সামনে গিয়ে গ্রিলে চেপে থাকা লোকটার হাত দুটো চেপে ধরি আমি আমার দু'হাত দিয়ে।'

'কী বলছিস তুই! ভয় করল না তোর?'

সাতিল এসে বসেছে রাসাদের আরেক পাশে। উত্তেজনায় সেও আরেকটা হাত চেপে ধরেছে রাসাদের। রাসাদ হাসতে হাসতে বলল, 'মোটেও ভয় করেনি। কারণ, এক. লোকটার দু'হাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, গ্রিল চেপে ধরা ছিল দু'হাত। হাত আলগা করলেই এই তিনতলা থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার। দুই. লোকটা গ্রিলের ওপাশে, আমি এপাশে। বেশি কিছু করতে চাইলে সে শুধু মুখ দিয়ে থুতু ছিটাতে পারতেন আমার দিকে, তাও তিনি করেননি। আমি হাত দুটো চেপে ধরতেই লোকটা মুখ হাসি হাসি করে বললেন, বাবা, কেমন আছ?'

'তোকে বাবা বলল চোরটা?'

'কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলে তার জবাব দিতে হয়। আমি বললাম, জি, ভালো আছি। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বললেন, রাতে খেয়েছ? আমি বললাম, খেয়েছি। লোকটা বললেন, তোমার বয়সী আমার একটা মেয়ে আছে, ছোট দুটো ছেলেও আছে। তারা কিন্তু খায়নি। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, কারণ বাড়িতে কোনো খাবার নেই আমার।' রাসাদ চুপ হয়ে গেল।

সাতিল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মামা, তারপর?'

'মন খারাপ হয়ে গেল আমার। ছোট ছোট কয়েকটা ছেলে-মেয়ে না খেয়ে আছে, ভাবতেই কেমন যেন করে ওঠে আমার ভেতর। প্যান্টের পকেটে এক শ' টাকার একটা নোট আর খুচরো কয়েকটা টাকা ছিল আমার। সবগুলো লোকটাকে দিয়ে দেই আমি।' রাসাদ সাতিলের আম্মুর মুখের তিকে তাকিয়ে বলল, 'টাকাগুলো আনার জন্য আমি যখন লোকটার হাত ছেড়ে দিয়ে ওই ওয়ারড্রোবের কাছে আসি, তখন কিন্তু তিনি দ্রুত নেমে গিয়ে পালিয়ে যেতে পারতেন। তিনি কিন্তু তা যাননি।'

'মামা—।' খাট থেকে নেমে সাতিল একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল রাসাদের, 'টাকাগুলো নিয়েছেন লোকটা?'

'প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিলেন। আমি জোর করতেই নিলেন।'

'যাওয়ার সময় কিছু বলেছেন তিনি?' একটু এগিয়ে এসে খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল সাতিল।

'বাথরুমের পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ আবার সোজা হয়ে দাঁড়ান। চেহারা লাজুক করে বলেন, আমরা চোর। আমাদেরও দরকার আছে। আমাদের মতো খারাপ মানুষ না থাকলে পুলিশ দিয়ে কী হবে। আমরা না থাকলে সব পুলিশের চাকরি চলে যাবে না! আর চাকরি চলে গেলেই তো সবাই না খেয়ে থাকবে। আর না খেয়ে থাকলেই তো এ রকম পাইপ বেয়ে উঠে কারো জানালায় আসতে হবে। আমাদের মতো সেই চুরি করতে হবে। সেই লাউ সেই কদু। আরো একটা কথা। আমরা যাদের জিনিস চুরি করি, সেসব জিনিস তো আবার কিনতে যান তারা দোকানে। তারা কিনতে না গেলে দোকানদাররা বিক্রি করবেন কী? তাদের বিক্রি না হলে তো সেই না খেয়েই থাকতে হবে। শেষে আমাদের মতো আবার

পাইপ বেয়ে অন্যের ঘরের জানালায় দাঁড়াতে হবে। সুতরাং আমরা আছি বলেই না অনেকে আছেন। কী ঠিক বলেছি বাবা?'

'খুব সুন্দর কথা বলেছেন তো তিনি!' সাতিল খুব আনন্দ নিয়ে বলল।

বাসার পেছন থেকে চিৎকার হঠাৎ জোরে শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাসাদ বলল, 'ঘুম থেকে উঠেই শব্দ শুনেছি আমি। ভেবেছি এমনি। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে শোনা যাচ্ছে সেটা। সাতিল— ।' রাসাদ উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের টি-শার্টটা বদলাতে বদলাতে বলল, 'চল তো দেখে আসি। প্রতিবেশীর কোনো সমস্যা হলে এগিয়ে যেতে হয়।'

বাসার পেছনের রাস্তায় আসতেই সাতিল দেখল, জহির এবং এলাকার আরো কয়েকটা ছেলে এগিয়ে যাচ্ছে ওই বাসার দিকে। রাসাদকে ইশারা করে একটু জোরে হাঁটতে হাঁটতে সাতিল বলল, 'ওই যে নীল টি-শার্ট গায়ে দেওয়া ছেলেটা, উনি হচ্ছেন জহির ভাইয়া।'

'জহির আব্বাস? তোদের স্কুলের ট্যালেন্ট ছেলেটা।'

'জি।'

'জহির তো তোদের বাসার আশপাশেই থাকে, তাই বলেছিলি না তুই?'

'জি। ওই তো এক বাসা পরেই থাকেন।' সাতিল আরো একটু জোরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি আসো তো মামা। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই।'

কিন্তু দ্রুত হেঁটেও জহিরদের কাছাকাছি যেতে পারল না ওরা। তার আগেই ওই বাসার ভেতর ঢুকে পড়ল জহিররা। একটু পর সাতিলরাও ঢুকে পড়ল। জহিরদের মতো সরাসরি বারান্দায় না উঠে এক কোনায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন দুজন লোক। পাশে একজন মহিলাও দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের দেখেই মনে হচ্ছে এ বাসায় কাজ করেন তারা। জহির আর তার সঙ্গের ছেলেগুলো তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই থেমে গেল সবাই। চারপাশটা একপলক দেখে জহির বলল, 'সকাল থেকেই অনেক শব্দ শুনছি। ঘটনা কী?'

লম্বামতো লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জহির ভাই, আপনি তো আমাকে চেনেন। আমার নাম আজিজ, আমি এ বাসার মালি। ফুল ফুটানো,

গাছের পরিচর্যা করা, এসবই আমার কাজ। সকালে বাসার পেছনের বাগানে এসে ঘরের দিকে তাকাতেই দেখি, ঘরের কাচের জানালা ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠি আমি। দারোয়ান ঘুমাইতে ছিল। ওকে ডেকে তুলে ঘরের তালা খুলে দেখি, ঘরের সব দামি জিনিসপত্র হাওয়া।'

'এ বাসার দারোয়ান কে?' মালি আজিজকে জিজ্ঞেস করল জহির।

ডান পাশের লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ও। ওর নাম রশীদ।'

'বাম পাশের জন?' বাম পাশের জনকে দেখাল জহির।

মালি আজিজ বাম দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও হচ্ছে এ বাসার কেয়ারটেকার। ওর নাম জমসের।'

'আর উনি?' মহিলাটির দিকে তাকাল জহির।

'ও এ বাসায় কাজ করে। পার্মানেন্ট না, ছুটা বুয়া। ঘর ঝাড়ু, বাসন-কোসন মাজা, তরিতরকারি কেটে দেওয়ার কাজ করে ও।'

'নাম কী ওনার?'

'মর্জিনা।'

জহির ঘুরে দাঁড়িয়ে দারোয়ান রশীদের দিকে তাকাল, ভালো করে তাকাল। তার এভাবে তাকিয়ে থাকা দেখে মাথা নিচু করে ফেলল সে। বেশ কিছুক্ষণ রশীদকে দেখে জহির বলল, 'আপনি সম্ভবত কিছু বলতে চান।'

দারোয়ান রশীদ মিনমিনে গলায় বলল, 'জি।'

'বলুন।' জহির ছোট্ট অথচ গম্ভীর গলায় বলল।

'বাড়ির সবাই বিদেশে বেড়াতে যাওয়ায় আমরা তিনজন একই ঘরে শুয়ে ছিলাম। অনেক দিন পর বাসায় মালিক না থাকায় কেমন যেন লাগছিল আমাদের। ঘুম আসছিল না কারোরই। মাঝরাতের দিকে মনে হলো, বাইরের গেটটা ভালো করে লাগানো হয়নি, তালা মারা হয়নি ভালো করে। কথাটা মনে হতেই দ্রুত ঘর থেকে বাইরে বের হই, সঙ্গে আজিজ ভাই ও জমসের ভাইকেও ডেকে নিয়ে যাই। কিন্তু বাইরে এসেই চমকে উঠি আমরা। হালকা-পাতলা শরীরের একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল বাগানের কোনায়। আমাদের দেখেই দৌড়ে পালিয়ে যায় দ্রুত বেগে।'

'রাতে এ বাসার ভেতর ঢোকা যায় নাকি! শুনেছি তো এ বাসার চারপাশটা খুব ভালো করে আটকানো।' জহির বলল।

'ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু এ বাসার দেওয়াল ঘেঁষে একটা সরকারি ড্রেন তৈরি করা হয়েছে। ছোট ধরনের ড্রেন। মাঝে মাঝে টোকাই শ্রেণীর কিছু ছেলে ওই ড্রেন দিয়ে এ বাসায় ঢোকে। ওই হালকা-পাতলা শরীরের মানুষটাও টোকাই ছেলেদের মতো লম্বা ছিল। তাকে ওই ড্রেনের দিকে দৌড়ে যেতে দেখেছি।'

'আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এমনভাবে পালাল— ।' মালি আজিজ একটু সোজা দাঁড়িয়ে বললেন, 'কোনো টোকাই-ই হবে হয়তো। কোনো একসময় এ বাসায় ঢুকেছিল ওই ড্রেন দিয়ে। কিছু নিতে পারেনি। কিন্তু অপেক্ষায় ছিল। কাল জানতে পেরেছে এ বাসায় সবাই বিদেশে বেড়াতে গেছে। এই সুযোগে বাসার ভেতর ঢুকেছিল সে।'

জহির মালি আজিজের দিকে ঘুরে তাকাল, 'আপনারও তাই মনে হয়?'

'আমি নিজ চোখে দেখলাম টকটকে একটা লাল গেঞ্জি পরে এসেছিল টোকাই ছেলেটা।'

'বাসার চারপাশে তো অল্প আলোর লাইট জ্বালানো হয়, আপনি ছেলেটার গেঞ্জির কালার দেখলেন কীভাবে?'

'বাসার চারপাশে অল্প আলো জ্বললেও রাস্তার সবগুলো লাইট তো জ্বলছিল।' মালি আজিজ বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'ড্রেনের পাশেই তো একটা লাইটপোস্ট আছে, লাইটও আছে সেটাতে।'

জহির কেয়ারটেকার জমসেরের দিকে তাকাতেই তিনি ভীত গলায় বললেন, 'ওই টোকাই ছেলেটা যদিও মাঝরাতের দিকে এসেছিল, কিন্তু আমার মনে হয় সব কিছু চুরি করেছে সে শেষরাতের দিকে।'

'আপনার এ কথা মনে হওয়ার কারণ?'

'ঘন ঘন প্রস্রাবের একটা সমস্যা আছে আমার। রাতে কয়েকবার প্রস্রাবের জন্য বাথরুমে যেতে হয় আমাকে। টোকাই ছেলেটা পালিয়ে যাওয়ায় আমরা ভেবেছিলাম ও আর আসবে না। কিন্তু শেষরাতের দিকে প্রস্রাবের জন্য বাথরুমে যাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ কাচ ভাঙার শব্দ আসে কানে। কিন্তু সেই কাচ ভাঙাটা যে এই বাসাতেই ভাঙা হয়েছে, সেটা তখন মাথায় আসেনি আমার। রাতে কয়েকবার উঠতে হয় বলে ঘুম একটু বেশি হয় ভোরের দিকে। কিন্তু আজিজ ভাইয়ের চিৎকার শুনে উঠে দেখি

আমাদের বাসারই জানালার কাচ ভাঙা।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললেন কেয়ারটেকার জমসের।

জহির কয়েক সেকেন্ড জমসেরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বুয়া মর্জিনার দিকে তাকাল। কিছুটা লজ্জা পেলেন মর্জিনা। আঁচলটা টেনে মাথাটা ঢাকতে তিনি যতটা না ব্যস্ত, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত তার ডান হাতটা লুকানোতে। ব্যাপারটা টের পেল জহির। বুয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনার ডান হাতটা দেখি।'

বুয়া মর্জিনা হাত তো দেখালই না, বরং আরো লুকানোর চেষ্টা করল। জহির একটু রূঢ় গলায় বলল, 'হাত দেখাতে বললাম না আপনাকে!'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডান হাতটা সামনের দিকে একটু এগিয়ে দিলেন বুয়া। জহির চোখ দুটো কুঁচকে বলল, 'আপনার হাতে সমস্যা কী? কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছেন হাত।'

'হাত কেটে গেছে।' অস্পষ্ট স্বরে বললেন বুয়া।

'কীভাবে?'

'আরেক বাসায় কাজ করি আমি। কাল শিং মাছ কাটতে গিয়ে বঁটি দাওয়ের সঙ্গে লেগেছিল হাতটা। বড় করে কেটে গেছে।'

'তাই নাকি!' কিছুটা অবিশ্বাসের স্বরে বলল জহির। বুয়ার হাতের দিকে ভালো করে তাকাল সে, 'আরেকটা কোন বাসায় কাজ করেন আপনি?'

'চার নম্বর রোডের তেইশ নম্বর বাসা।'

'চার নম্বর রোডের তেইশ নম্বর বাসা?' জহির আনমনে ভাবতে ভাবতে বলল, 'দিয়াদের বাসা?'

'জি, দিয়া আপুদের বাসা।'

জহির সবার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'এ বাসার মালিক আমার এক ধরনের আঙ্কেল হন। ওনার বাসায় চুরি হয়েছে, সেটার ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া আমার দায়িত্ব। আমার আব্বু আর আম্মু একটু পর আসবেন এ বাসায়। তার আগে সমস্ত বাসাটা আমি একবার ঘুরে দেখতে চাই।'

পা বাড়াল জহির সামনের দিকে। পেছনে পেছনে আর সবাইও যেতে লাগল। রাসাদ আর সাতিল দ্রুত বাসার ভেতরটা দেখে পেছনের ড্রেনের পাশে এসে দাঁড়াল। দু-তিন সেকেন্ড সেখানে দাঁড়িয়ে ফিরে এলো তারা বাসার গেটের কাছে। জহির আর তার বন্ধুরা বের হয়ে আসছে বাসা

থেকে। সাতিলকে দেখেই জহির বলল, 'সাতিল, তোমাকে দেখেছি আমি। অনেকক্ষণ আগে এসেছ। কিছু বলবে?'

সাতিল রাসাদকে দেখিয়ে বলল, 'আমার ছোট মামা। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছি।'

জহির হাত বাড়াল দ্রুত। সঙ্গে সঙ্গে রাসাদও। দুজনের পরিচয়ের পালা শেষ হতেই রাসাদ বলল, 'মালি, কেয়ারটেকার, দারোয়ান—তিনজনই মিথ্যা কথা বলেছে তোমাকে।'

'মিথ্যা কথা বলেছে!'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে বুঝলে তুমি?'

মিষ্টি একটা হাসি দিল রাসাদ, 'তুমি ক্লাস এইটে পড়ো, আমিও। আজ তোমার ক্লাসে যাব আমি। তারপর সব জানতে পারবে।' জহিরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়ে সাতিলের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াল রাসাদ। জহির অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলল, খুব বেশি বুদ্ধি কী ছেলেটার!

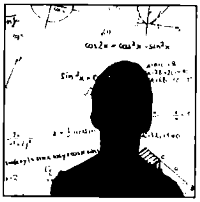

বাদল স্যার অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করছেন জহিরকে। আজ কেমন যেন সে আনমনা। তিনি এ স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। খুব ভালো অঙ্ক শেখান তিনি ছাত্রদের। যতক্ষণ না সবাই কোনো অঙ্ক বুঝছে, ততক্ষণ তিনি বোঝাতেই থাকেন, খুব যত্ন করে বোঝাতে থাকেন। ক্লাস এইটের এই ক্লাসে অনেকগুলো প্রিয় ছাত্র আছে তার, তাদের মধ্যে জহির একজন। এত দিন ধরে তাকে যেভাবে দেখছেন তিনি, আজ সে অন্য রকম। অন্যান্য দিন ঝট ঝট করে উত্তর দেয় সে, প্রশ্নও করে মজার মজার, আজ কোনো উত্তরও দিচ্ছে না, প্রশ্নও না। চুপচাপ বসে আছে সে। মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে ভাবছেও কী যেন। দেখে মনে হচ্ছে, গভীর কোনো ভাবনা।

ছাত্রদের কাছে এ স্কুলের সবচেয়ে প্রিয় স্যার হচ্ছেন এই বাদল স্যার। তিনি যা বলবেন, প্রতিটা ছাত্র এক বাক্যে তা মেনে নেবে। অথচ স্যারের বয়স খুব বেশি না। কয়দিন আগে মাস্টার্স শেষ করেছেন। তিনি প্রায়ই স্কুলের পাশের মাঠে ছাত্রদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন।

ব্ল্যাকবোর্ডের পাশ থেকে সরে এলেন স্যার। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন তিনি জহিরের দিকে। তার বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আলতো হাত হাত রাখলেন তার কাঁধে। খুব শান্ত গলায় বললেন, 'মন খারাপ জহির?'

মাথা উঁচু-নিচু করল জহির। মুখে কিছু বলল না।

'মন খারাপ!' বাদল স্যার বিশ্বাসই করতে পারছেন না জহিরের কখনো মন খারাপ হতে পারে। তিন বছর হলো তিনি এই স্কুলে এসেছেন। সেই ক্লাস সিক্স থেকে দেখছেন তাকে। কখনো ম্লান মুখে দেখেননি তাকে। সারাক্ষণ কী হাসি-খুশি থাকে ছেলেটা। নিজে তো আনন্দে থাকেই, অন্যকেও আনন্দে রাখে।

স্যার জহিরের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'তোমার মন খারাপ এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না জহির।'

বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল জহির। মাথার পেছনে হাত নিয়ে চুলকাতে লাগল এমনি এমনি। স্যার ওর ওই মাথার পেছনের হাতটা ধরে নিচে নামিয়ে বললেন, 'তোমাকে একটু অস্বাভাবিকও লাগছে। কিন্তু তুমি তো এ রকম না।'

জহির ছোট্ট করে বলল, 'জি।'

'সত্যি করে বলো তো জহির—।' স্যার বেশ উদগ্রীব হয়ে বললেন, 'আসলে তোমার কী হয়েছে?'

মাথা নিচু করে ছিল জহির। একটুক্ষণের জন্য উঁচু করে চারপাশটা দেখে নিল সে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, বিব্রতও হলো। সবাই কেমন যেন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে মীরন হাসতে হাসতে বলল, 'স্যার, জহির আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে। দেখেন, বুদ্ধি খরচ করে গোপন কিছু করে ফেলেছে কি না।'

স্যার হাসি হাসি মুখে মীরনের দিকে তাকালেন, 'তোমার কি মনে হয় জহির গোপন কিছু করার মতো ছেলে?'

'স্যার, কাউকেই বিশ্বাস নেই। বুদ্ধিমান ছেলেদের তো আরো না।' মীরন মুখে দুষ্টুমির হাসি এনে বলল, 'বুদ্ধিমান ছেলেরা মাঝে মাঝে এমন বোকার মতো কাজ করে না। লজ্জায় তখন আর কাউকে মুখ দেখাতে পারে না, কিছু বলতেও পারে না।'

'তাই নাকি!' স্যার জহিরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'কী জহির, কোনো গোপন কিছু আছে নাকি তোমার?'

লজ্জা পেল জহির। মাথা নিচু করে ফেলে বলল, 'এই প্রথম আমার মনে হচ্ছে, আমার মাথায় আসলে বুদ্ধি তেমন নেই। আমার আরো বুদ্ধি বাড়ানো দরকার, খুব দ্রুত দরকার।'

কপাল কুঁচকে ফেললেন স্যার, 'তোমার হঠাৎ এ রকম মনে হওয়ার কারণ?'

'সকাল থেকে একটা জিনিস ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু মেলাতে পারছি না। বারবার চেষ্টা করছি, তবুও মিলছে না।'

'উত্তেজনা না নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাব।'

'ঠাণ্ডা মাথাতেই ভেবেছি। কিন্তু মিলছে না।'

'আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

'সিওর। কিন্তু আপাতত আমি আপনার সাহায্য নেব না। আরো কিছুক্ষণ আমি চেষ্টা করতে চাই। না পারলে আপনাকে বলব। অবশ্য— ।' জহির একটু থেমে বলল, 'একজন অবশ্য সব জানাতে চেয়েছে আমাকে।'

'কে সে?'

'আজ সকালে নতুন পরিচয় হয়েছে তার সঙ্গে। ক্লাস সিক্সে একটা ছেলে পড়ে না, সাতিল নাম, খুব চটপটে ছেলেটা, ওর ছোট মামা।'

'তুমি কি রাসাদের কথা বলছ?'

জহির চমকে উঠে বলল, 'ইয়েস। আপনি ওকে চেনেন স্যার!'

'চিনি।'

'কীভাবে?'

স্যার কিছু বললে না। মুচকি হাসলেন। পরশু হেড স্যারের রুমে যে রাসাদ গিয়েছিল, কথা বলেছে বেশ মজার মজার, সেটা চেপে গেলেন তিনি। কাল বিকেলে সাতিলের সঙ্গে মংরা নদীর পাশে যে বসে থাকতে দেখেছেন ছেলেটাকে, চেপে গেলেন সেটাও।

জহিরের কাঁধে আবার হাত রাখলেন স্যার, 'তোমার ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছি জহির। রাসাদ হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান, তুমিও তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার চেয়ে বুদ্ধিমান। হিনম্মন্যতায় না ভুগে তোমরা যদি তোমাদের বুদ্ধিকে একত্রে কাজে লাগাও, তাহলে অনেক ভালো কিছু করতে পারবে একসঙ্গে।'

মন ভালো হয়ে গেল জহিরের। সত্যি তো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য একজনের বুদ্ধি তার চেয়ে বেশি থাকতেই পারে, তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বুদ্ধিও বেশি থাকতে পারে অন্যদের চেয়ে। এতে মন খারাপের কিছু নেই। বরং সবাই মিলে কাজ করলে ভালো কিছু করতে পারবে তারা। কিন্তু রাসাদের তো আজ এই ক্লাসে আসার কথা, আসছে না কেন? একটু পর টিফিন পিরিয়ড শুরু হবে, ছেলেটা আসবে তো!

টিফিন পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়তেই অঙ্ক স্যার বের হয়ে গেলেন ক্লাস থেকে। ক্লাসের সব ছাত্ররা যখন ব্যাগ গুছিয়ে বাইরে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই সোজা হয়ে দাঁড়াল তাদের অনেকেই। একটা ছেলে ঢুকছে ক্লাসে। হাতে সবুজ রঙের একটা সিরামিকের মগ, মাঝারি সাইজ। আরেক হাতে একটা কাচের গ্লাস। তিন ভাগের দু'ভাগ পানি ভর্তি।

ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে যে কাঠের বেদিটা আছে, ক্লাসে ঢুকে যেখানে এসে স্যাররা দাঁড়ান, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটি। পাশে টেবিলের ওপর সবুজ মগ আর পানি ভর্তি গ্লাস রেখে সামনের দিকে তাকাল। জহির খুব মনোযোগ দিয়ে ব্যাগ গোছাচ্ছিল, হঠাৎ ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাতেই রাসাদকে দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর ধুক করে উঠল তার, আনন্দও হতে লাগল। যাক, শেষ পর্যন্ত ছেলেটা এসেছে।

কাঠের বেদির সামনের দিকে এগিয়ে এলো রাসাদ। মুখটা হাসি হাসি করে ফেলল সে। ক্লাসে সব ছাত্র ব্যাগ গোছানো বাদ দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তারা বুঝতে পারছে না তাদের বয়সী এই অপরিচিত ছেলেটা হঠাৎ ক্লাসে ঢুকল কেন, তার হাতে ও রকম মগ আর পানির গ্লাস-ইবা কেন! সবচেয়ে সাহসের কথা হলো—স্যাররা ক্লাসে ঢুকে যেখানে এসে দাঁড়ান, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে কেন সে!

জহির তৃতীয় সারির বেঞ্চে বসেছিল, স্কুলের ব্যাগটা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে এলো সে। প্রথম সারির বেঞ্চের দিকে এগিয়ে এসে ব্যাগটা রাখল একটা বেঞ্চে। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে সে রাসাদের দিকে। আড়চোখে তাকিয়ে জহির বুঝতে পারল, শুধু সে না, ক্লাসের সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে রাসাদের দিকে। ক্লাসের সবচেয়ে চঞ্চল যে ছোটন, সেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাসাদকে দেখছে।

'তোমরা কি কখনো ঢাকার রাস্তায় যে বাসগুলো চলে সেগুলোতে চড়েছ?' সামনের দিকে তাকিয়ে সবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল রাসাদ।

দু-একজন স্পষ্ট স্বরে, কয়েকজন অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো অবশ্যই হকারদের দেখেছ, ওই যে যারা বাসের ভেতর কলম, বাচ্চাদের জন্য হরেক রকম খেলনা, বিভিন্ন ধরনের বই বিক্রি করে।' রাসাদ সবার দিকে ভালো করে খেয়াল করে বলল, 'তারা বাসে উঠেই প্রথমে কী বলেন—মুসলমান ভাইদের সালাম, হিন্দু ভাইদের নমস্কার, অন্যান্য ধর্মের ভাইদের শুভ সকাল বা শুভ বিকেল...।' রাসাদ মুখটা হাসি হাসি করে সবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বলল, 'এই রকম বলে না!' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'কিন্তু কাউকে বলতে শুনিনি শুভ দুপুর। আচ্ছা, দুপুর কি কখনো শুভ হয় না! আমিও তোমাদের ক্লাসে এসেছি এই দুপুরে, এই টিফিন পিরিয়ডে, কথা বলার আগে আমার

বলা উচিত ছিল শুভ দুপুর। কিন্তু আমিও সেটা বলতে পারলাম না, শুভ দুপুর শব্দটা আমার মুখ দিয়ে আসল না। শুভ দুপুর শব্দটা কেমন শোনায় না! কী ঠিক?'

কেউ কিছু বলল না। কেবল একে অপরের দিকে একপলক তাকাল।

'যাক, ওসব এখন থাক। এই ক্লাসে সবচেয়ে কে বেশি জাদু ভালোবাসে?'

সামনের বেঞ্চ থেকে একটা হাত ওঠাল। রাসাদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি সিওর তোমার নাম সাদমান। পুরো নাম সাদমান সাকিব। অ্যাম আই রাইট?' সাদমানের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল রাসাদ।

'ইয়েস।' সাদমান চোখ দুটো গোল গোল করে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার তো কখনো দেখাই হয়নি। তুমি আমার নাম জানলে কী করে?'

'ছোটখাটো জাদু জানি আমি। সেটা দিয়েই আমি তোমার নামটা জেনেছি।' রাসাদ আবার সবার দিকে তাকাল, 'যেহেতু সাদমান জাদু খুব পছন্দ করে, সেহেতু সাদমানের সম্মানে আমি একটা জাদু দেখাব এখন তোমাদের।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'তোমরা কি জাদু দেখতে চাও?'

আনন্দ নিয়ে সবাই কিছুটা শব্দ করে বলল, 'অবশ্যই।'

পেছনের দিকে একটু ফিরে এলো রাসাদ। টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সবুজ রঙের সিরামিকের মগটা বাম হাতে নিল। একটু উঁচু করে ধরে সবাইকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে তোমরা মগটা দেখছ, এটার রং তো সবাই চেনো—সবুজ।' ডান হাত দিয়ে পানিভর্তি গ্লাসটা নিয়ে বলল, 'আমি এখন এই সবুজ মগের ভেতর এই গ্লাসের পানিগুলো ঢালব।' বলেই সে মগের ভেতর গ্লাসের অর্ধেকের বেশি পানি ঢেলে দিল। তারপর গ্লাসটা আবার টেবিলে রেখে ডান হাতে নিল সিরামিকের মগটা।

রাসাদ আবার কাঠের বেদির সামনের দিকে এগিয়ে এলো। ডান হাতটা উঁচু করে ওপরের দিকে তুলল মগটা। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'তোমরা তো দেখলে এই মগের ভেতর পানি ঢাললাম আমি। নাকি জুস ঢেলেছি?'

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলল, 'না, পানি।'

'পানির ধর্ম হচ্ছে নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়া। এটা জানো তোমরা?'

'এটা বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি আমরা।' অনেকে বলল।

'তাহলে আমি যদি আমার হাতের এই মগটা কাত করি, তাহলে ধর্ম অনুযায়ী এটা থেকে পানির তো গড়িয়ে পড়ার কথা। তাই না?' রাসাদ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল সবাইকে।

'হ্যাঁ।' কেউ শব্দ করে, কেউ কিছুটা চিন্তাযুক্ত হয়ে বলল।

কিছুক্ষণ আগে পানিভরা সবুজ সিরামিকের মগটা কাত করল রাসাদ। কিন্তু কোনো পানি গড়িয়ে পড়ল না সেখান থেকে। এক টুকরো আইস কিউব বেরিয়ে এলো মগ থেকে। সবার চোখ বড় হয়ে গেছে। এটা কী করে সম্ভব! মগে ঢালা হলো পানি, আর মাত্র দু-চার সেকেন্ডেই সেটা বরফে পরিণত হলো। লুডুর ছক্কার মতো চার কোনা বরফের টুকরোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে দিল সে সাদমানের দিকে। চোখ বড় বড় করে সেটা হাতে নিল সাদমান। তার মুখে কোনো কথা নেই। বরফের টুকরোটার দিকে সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন এ রকম জিনিস সে আর কখনো দেখেনি।

ক্লাসের সব ছাত্রই এগিয়ে এলো সাদমানের দিকে। সবাই বরফের টুকরোটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সাদমান প্রচণ্ড অবাক গলায় বলল, 'এটা তো অসম্ভব!'

রাসাদ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'মোটেই অসম্ভব না, সম্ভব।'

সাদমান অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলল, 'কীভাবে!'

'তুমি কি এই জাদুটা শিখতে চাও?'

'অবশ্যই।'

'তুমি যেহেতু জাদু ভালোবাসো, সেহেতু জাদুটা তোমাকে শেখাব আমি।' রাসাদ সবার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু সবার সামনে কি এটা শেখানো ঠিক হবে? তাহলে তো সবাই জেনে যাবে। জাদুর আর কোনো রহস্যই থাকবে না তখন!' রাসাদ কাঠের বেদি থেকে নামতে যাচ্ছিল, তার আগেই জহির বলল, 'তুমি বরং জাদুটা আমাদের সবাইকে শিখিয়ে দাও। একটা জাদু শেখার পর হয়তো আরো অনেকেই সাদমানের মতো জাদুকে ভালোবাসবে।' জহির খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'প্লিজ, শুরু করো।'

টেবিলের পাশে ফিরে এলো রাসাদ। সবুজ সিরামিকের মগটা আবার বাম হাতে নিয়ে টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা ডান হাতে নিল সে। গ্লাসের বাকি পানিটুকু ঢেলে দিল মগে। একটু পর মগটা উপুড় করল, কিন্তু কোনো বরফের টুকরো বের হলো না সেখান থেকে। রাসাদ হাসতে হাসতে বলল,

'কী বুঝলে?' সাদমানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে সে বলল, 'মগে পানি ঢাললেই দ্রুত বরফ জমে না সেখানে।' রাসাদ মগটা সাদমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো তো কী আছে এর ভেতর?'

মগটা হাতে নিয়ে ভেতরে উঁকি দিল সাদমান, 'ভেতরে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি। স্পঞ্জের মতো মনে হচ্ছে জিনিসটা।'

'হ্যাঁ, ওটা একটা স্পঞ্জ।' সাদমানের হাত থেকে মগটা আবার ফেরত নিয়ে ভেতর থেকে স্পঞ্জটা বের করতে করতে রাসাদ বলল, 'প্রথমে এই স্পঞ্জটা শুকনোই ছিল। এই শুকনো স্পঞ্জটা এই মগের ভেতর আগেই লুকিয়ে রাখতে হবে। ও রকম চার কোনা একটা বরফের টুকরো বানাতে হবে ফ্রিজে। সেটাও লুকিয়ে রাখতে হবে মগের ভেতর ওই স্পঞ্জের ওপরে। এখন তুমি যখন কাচের গ্লাসের কিছু পানি এই মগে ঢালবে, স্পঞ্জ তখন সবটুকু পানি শুষে নেবে। একটু পর তুমি আঙুল দিয়ে আগে থেকেই মগে ঢুকিয়ে রাখা বরফের টুকরোটা বের করে সবাইকে দেখাবে। সবাই ভাববে, আরে, মগে পানি ঢালার পর পরই বরফ হলো কীভাবে!'

'খুব চমৎকার একটা ম্যাজিক।' খুব উৎফুল্ল হয়ে বলল সাদমান।

'আরো বেশ কয়েকটা এ রকম ম্যাজিক জানা আছে আমার।' রাসাদ সাদমানের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'তুমি যেহেতু ম্যাজিক ভালোবাসো, সেগুলো আমি শিখিয়ে দেব তোমাকে।' সোজা হয়ে দাঁড়াল রাসাদ। সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এখন তো টিফিন পিরিয়ড, আমি কি তোমাদের সময় নষ্ট করলাম?'

সকলে প্রায় একসঙ্গে বলল, 'না।'

'আমি কি আরো একটু সময় নিতে পারি তোমাদের?'

আগের মতোই সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'সিওর।'

হাতের জিনিসগুলো টেবিলে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাসাদ। মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি এনে বলল, 'আমি তোমাদের এখন একটা বাক্য বলব। তারপরই পাঁচটা সত্য ঘটনা ঘটবে।' রাসাদ সবার দিকে ভালো করে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখেই বলল, 'বলব?'

জহির প্রথমে হাত উঁচু করে বলল, 'বলো।' সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও হাত উঁচু করে সম্মতি জানাল।

মুখের হাসিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে রাসাদ বলল, 'তোমরা তোমাদের জিভ দিয়ে তোমাদের সবগুলো দাঁত স্পর্শ করতে পারবে না।'

রাসাদ হাত দিয়ে বিশেষ একটা ভঙ্গিমা করে বলল, 'আমার বাক্য শেষ। এখন পাঁচটা সত্য ঘটনা ঘটবে।'

দশ-বারো সেকেন্ড পর রাসাদ বলল, 'কী, ঘটনা কিছু ঘটেছে?'

জহির বলল, 'কই?'

সাদমানের দিকে তাকিয়ে রাসাদ বলল, 'সাদমান?'

'কই, আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

রাসাদ আবার হেসে ফেলল, 'আমি যখন বললাম তোমরা তোমাদের জিভ দিয়ে তোমাদের সবগুলো দাঁত স্পর্শ করতে পারবে না। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যার যার জিভ দিয়ে ব্যাপারটা পরীক্ষা করেছ।' সবার দিকে একপলক তাকাল রাসাদ, 'কী, ঠিক?'

সবাই হেসে ফেলল। কেউ কেউ লাজুক স্বরে বলল, 'ঠিক।'

'পরীক্ষা করার পর বুঝতে পেরেছ আমার বাক্যটা ঠিক না। তাই না।'

'হ্যাঁ।' সবাই বলে উঠল।

'বোকার মতো তোমরা তখন হেসে উঠেছ, না?'

বোকার মতোই সবাই আবার হেসে উঠল নিঃশব্দে। রাসাদ তাই দেখে হাসতে হাসতেই বলল, 'তারপরই তোমার কোনো এক বন্ধুকে বোকা বানানোর চিন্তা আসে তোমার মাথায়। এবং সেটা যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছ তুমি। ঠিক?'

কেউ কিছু বলল না। কেবল উঁচু-নিচু করল যার যার মাথা।

'এবং বন্ধুকে বোকা বানাতে পারবে বলে ভেবেই তুমি চালাকির একটা হাসি হেসে ফেলেছ নীরবে। ঠিক?'

চোখে-মুখে চালাকি এনেই হেসে ফেলল সবাই।

রাসাদ খুব তৃপ্তি নিয়ে বলল, 'কতগুলো সত্য আছে, যা আমাদের জানা দরকার।' রাসাদ দু'হাত একসঙ্গে করে আয়েশ নিয়ে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা বলে টেলিভিশনে যে সংবাদ শুরু হয়, সন্ধ্যাটা মাটি করার জন্য তারপরই যত সব অশুভ সংবাদ শুনতে থাকবে তুমি।' রাসাদ হাসছে।

পেছন থেকে একটা ছাত্র বলল, 'একদম ঠিক।'

'ভয় পাওয়া ভালো। তবে দেখবে, যেসব ব্যাপার নিয়ে তুমি ভয় পাচ্ছ তার নব্বই ভাগই তোমার জীবনে ঘটবে না।' রাসাদ বলল।

'খু খু খু খুব সত্য।' ডান পাশ থেকে তোতলাতে তোতলাতে বলল আরেকজন ছাত্র।

'ওপর থেকে পড়ার সময় কেউ কখনো মরে না। তখনই মরে যখন মাটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে যায় সে।'

হাততালি দিতে দিতে আরেকটা ছাত্র বলল, 'তাই তো!'

'ব্যাংক তোমাকে তখনই টাকা ধার দেবে, যখন তুমি প্রমাণ করতে পারবে যে তুমি প্রচুর ধনী।'

'ঠিক।' বাম পাশ থেকে স্বাস্থ্যবান একটা ছেলে বলল, 'আমার বাবার অনেক টাকা, তবুও প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো ব্যাংক থেকে ফোন আসে বাবা কোনো লোন নেবে কি না। কিন্তু গ্রামে আমার এক নানা আছেন, কৃষক, তাকে কোনো ব্যাংক লোন দিতে চায় না।'

'কিছু লোক আছেন, তারা যেখানেই যান, আনন্দে ভরে তোলেন সেখানটা। কিছু লোক আছেন, যারা যেখান থেকে চলে যায়, আনন্দে ভরে ওঠে সেইখানটা।'

'যেমন তুমি।' চেহারাটা আনন্দময় করে সাদমান বলল।

চেহারাটা লাজুক হয়ে গেল রাসাদের। একটু থেমে থেকে স্বাভাবিক হয়ে সে আবার বলল, 'তোমরা কি বলতে পারবে—যথেষ্ট আর প্রচুর এই শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?'

সবাই চুপ। বেশ কিছুক্ষণ পর জহির বলল, 'তুমিই বলো।'

'যদি তোমার মা ফ্রিজ থেকে তোমার জন্য আইসক্রিম এনে দেন, তাহলে সেই পরিমাণটা হবে তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যদি তুমি নিজে ফ্রিজ থেকে তোমার জন্য আইসক্রিম নাও, তাহলে সেই পরিমাণটা হবে প্রচুর।'

শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। কেউ কেউ এসে হ্যান্ডশেক করল রাসাদের সঙ্গে। বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর রাসাদ বলল, 'এতক্ষণ ধরে অনেক বকবক করলাম তোমাদের সামনে। তোমাদের টিফিন পিরিয়ডটা নষ্ট করলাম। নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছ তোমরা!'

'না।' চিৎকার করে উঠল সবাই।

'থ্যাঙ্কস। আমি এবার আমার পরিচয়টা দেই। আমি রাসাদ, রাসাদ ইশরাক। ঢাকার হলি অ্যাঞ্জেল স্কুলের ক্লাস এইটে পড়ি আমি। আরো একটা ছোট্ট কথা আছে আমার—পৃথিবীতে বন্ধুর চেয়ে ভালো কোনো

জিনিস আর থাকতে পারে না।' রাসাদ মাথা নিচু করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি তোমাদের সবাইকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই।' বলেই দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল রাসাদ। সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাসাদের দু'হাতের মাঝখানে। চোখ ভিজে উঠল ওর। সত্যি, বন্ধু পাওয়া অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। জড়িয়ে ধরেই কানের কাছে মুখ নিয়ে জহির ফিসফিস করে বলল, 'সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ওই যে চুরি হয়েছে যে বাড়িটায়। তুমি বলেছিলে, মালি, কেয়ারটেকার, দারোয়ান—তিনজনই মিথ্যা কথা বলেছে। সব কিছু খুলে বলতে চেয়েছ আমাকে। কখন বলবে?'

'বিকেলে স্কুলের পেছনে যে পুরাতন বাড়িটা আছে, তার ছাদে এসো। সব বুঝিয়ে দেব তোমাকে।' ফিসফিস করে বলল রাসাদও।

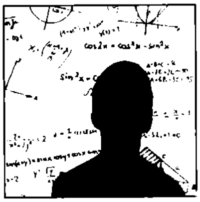

স্কুল থেকে ফিরে নিজের রুমে ঢুকল সাতিল, তারপর ব্যাগটা কোনোরকম কাঁধ থেকে নামিয়ে বিছানার ওপর ছুড়ে দিল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে আম্মু ঢুকলেন রুমে। কপাল ভাঁজ করে বললেন, 'স্কুল ছুটির পর তুই তো এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিস না! স্কুলের মাঠে অন্তত আধা ঘণ্টা খেলে তারপর ফিরিস। আজ কোনো সমস্যা?'

আম্মুর কথার দিকে পাত্তাই দিল না সাতিল। ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে সে বলল, 'মামা কই, আম্মু!'

'দুপুরে খাওয়ার পর রাসাদকে ছাদে যেতে দেখলাম। ল্যাপটপটাও সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

সাতিল দৌড়াতে শুরু করল ছাদের দিকে। তার আগেই হাত টেনে ধরলেন আম্মু। কিছুটা রেগে গিয়ে বললেন, 'স্কুল থেকে এই মাত্র এলি। বিকেল হয়ে গেছে। স্কুলে তো কেবল নাশতা করেছিস। হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খেতে হবে না এখন!'

আম্মুর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সাতিল বলল, 'ভাত খাওয়ার সময় নেই এখন। পরে খাব।' আম্মু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা শোনার আগেই সিঁড়ির কয়েক ধাপ পেরিয়ে ছাদের দিকে দৌড়াতে শুরু করল সে আবার।

ছাদের গেটের কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল সাতিল। নিজেকে একটু শান্ত করে পা রাখল ছাদে। পানির ট্যাংকির পাশে যে ছায়া আছে, সেখানে যে দুটো বেতের চেয়ার আর একটা কাঠের ছোট টেবিল আছে, মামা বসে আছে সেখানে। উদ্বিগ্ন চেহারা হাসি হাসি হয়ে গেল সাতিলের। রাসাদের একেবারে সামনে গিয়ে বলল, 'মামা, তুমি একটু ওঠো তো, সোজা হয়ে দাঁড়াও কিছুক্ষণ।'

রাসাদ কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কেন?'

'তোমাকে দাঁড়াতে বলেছি দাঁড়াও।'

'আগে বলবি তো কেন দাঁড়াব!' ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই রাসাদ বলল।

'আগে দাঁড়াও, তারপর বলছি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল রাসাদ। সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট দেওয়ার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল সাতিল। রাসাদ অবাক হয়ে বলল, 'এটা কী হচ্ছে!'

'তোমাকে স্যালুট দিচ্ছি মামা।'

'কেন?'

'কেন?' সাতিল হঠাৎ রাসাদকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি তো মামা হাউকাউ বাধিয়ে দিয়েছ! ক্লাস এইটের সব ভাইয়া তোমার নাম বলতে পাগল। টিফিন পিরিয়ডের পর তুমি তো বাসায় চলে এসেছ। তারপরই তো ক্লাস শুরু হয়েছে আবার। কিন্তু স্কুল ছুটির পর সারা স্কুল তোমাকে নিয়ে আলোচনা।' সাতিল একটু থেমে বলল, 'ক্লাস এইটে গিয়ে কী করেছ বলো তো মামা?'

'পরে বলছি। তার আগে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে হবে আমার।'

'ক্লাসে তুমি নাকি ম্যাজিক দেখিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ম্যাজিক জানো নাকি মামা?'

'ঠিক জানি না। এএক্সএন চ্যানেলে ব্রেকিং দ্য ম্যাজিশিয়ান কোড নামে একটা অনুষ্ঠান দেখায়, ওখান থেকে কিছু শিখেছি।'

'সাদমান ভাইয়াকে সবচেয়ে আনন্দিত দেখলাম সে জন্য।'

'সাদমানকে খুব পছন্দ হয়েছে আমার। খুব ভালো ছেলে ও।'

'মামা—।' সাতিল একটু থেমে খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যেটার জন্য আমি তোমাকে আমাদের এখানে ডেকে এনেছি, সেটার সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?'

রাসাদ দু'হাত দিয়ে সাতিলের দু'কাঁধ চেপে ধরে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ। তারপর চেহারাটা হাসি হাসি করে বলল, 'স্কুলে তো নাশতা করেছিস, ভাত তো খাওয়া হয়নি সম্ভবত। যা ভাত খেয়ে নে, রাতে তোর সঙ্গে কথা বলব।'

'বললে না কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?'

কিছু বলল না রাসাদ। রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে বসে পড়ল আবার ল্যাপটপের সামনে। শাট ডাউন করে সেটা সাতিলের হাতে দিয়ে বলল, 'যা, ঘরে রেখে ভাত খেয়ে নে।'

'তুমি কোথাও যাবে নাকি এখন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'তোদের স্কুলের পেছনের পুরনো বাড়িটার ছাদে।'

'কী জন্য মামা?'

'সেটাও পরে বলব।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব মামা।'

'তুই গেলে আমি যে জন্য এখানে এসেছি, সেটা শেষ করতে অসুবিধা হবে আমার।'

সাতিল সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ছলছল করে বলল, 'না না মামা, আমি তাহলে যাব না। তুমি একাই যাও। কিন্তু কাজটা তোমাকে করে দিতেই হবে মামা। যত কষ্টই হোক, করে দিতেই হবে।'

রাসাদ কিছু বলল না। আলতো করে সাতিলের মাথার চুলগুলো এলোমেলা করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। প্রিয় ভাগিনার চোখে পানি দেখে পানি এসে গেছে তার চোখেও।

স্কুলের পেছনের পুরাতন বাড়ির ছাদে এসেই কিছুটা চমকে উঠল রাসাদ। কোনায় বড় পিলারের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছে জহির। পাশে ওর স্কুল ব্যাগটা পড়ে আছে। রাসাদকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। একটু দ্রুত এগিয়ে গেল ওর দিকে। তারপর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'স্কুল ছুটির পর বাসায় যাওনি তুমি?'

ম্লান গলায় জহির বলল, 'না।'

'কেন?'

'তোমার সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ওরা কী মিথ্যা কথা বলল, এটা না জানা পর্যন্ত কোনো কাজই করতে পারব না আমি।' জহির রাসাদের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'ক্লাসে একদম মন বসাতে পারিনি। সারাক্ষণ তোমার কথা ভেবেছি।'

'বাসায় যাওনি, তোমার আব্বু-আম্মু চিন্তা করবেন না?'

'মোবাইল ফোনের দোকান থেকে আম্মুকে ফোন করে দিয়েছি বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে।'

'তুমি তো তাহলে দুপুরের খাবারও খাওনি!'

'নাশতা করেছি তো।'

'নাশতা করা আর দুপুরের খাওয়া এক হলো! তুমি দাঁড়াও, স্কুলের সামনে যে স্ন্যাকসের দোকানটা আছে ওখান থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসি।' রাসাদ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তার আগে হাত টেনে ধরে জহির বলল, 'এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমার সব কথা শোনার পর আমি খাব। আমার পাশে বসো, কথা বলা শেষ হলে তারপর নিচে গিয়ে দুজন একসঙ্গে কিছু খাব।'

হেসে ফেলল রাসাদ। জহিরের হাত ধরে বসে পড়ল সে ছাদের ওপর। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল, 'যে বাড়িটাতে চুরি হয়েছে, সেই বাড়িটা ভালো করে দেখেছ তুমি?'

'দেখেছি তো।' সোজা হয়ে বসল জহির, 'তুমি আর সাতিলও তো ছিলে। আমরা যেটা যেটা দেখলাম, তোমরাও তো সেটা দেখলে।'

'কিন্তু ভালো করে দেখোনি। খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করোনি।'

'কই, ভালো করেই তো দেখলাম, খেয়াল করলাম!'

রাসাদ মুচকি হেসে বলল, 'তোমাকে তাহলে প্রথম থেকে বলি। দারোয়ান রশীদ তোমাকে কী বলেছেন—তিনজন এক ঘরে শুয়েছিলেন তারা। কিন্তু কারোরই ঘুম আসছিল না। তাই ঘরের বাইরে এসেই চমকে ওঠেন তারা। হালকা-পাতলা শরীরের একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল বাগানের কোনায়। তাদের দেখেই দৌড়ে পালিয়ে যায় লোকটা।'

জহির ছোট্ট করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তিনি আরো বলেছেন, গেট ছাড়া ওই বাসার ভেতর নাকি ঢোকা যায় না। তবে একটা সরকারি ড্রেন আছে, ওটা দিয়ে নাকি মাঝে মাঝে টোকাই শ্রেণির কেউ কেউ বাসায় ঢোকে।'

জহির আবারও ছোট্ট করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাদের দেখে ফেলার পর ওই হালকা-পাতলা শরীরের লোকটাকে তারা ওই ড্রেনের দিকে দৌড়ে যেতে দেখেছেন। এবং ওখান দিয়েই নাকি পালিয়ে যেতে দেখেছেন তাকে।'

'হ্যাঁ, তাই তো বলল।'

রাসাদ চেহারাটা আবার হাসি হাসি করে ফেলল, 'কিন্তু ড্রেনের যে ছোট জায়গাটা দিয়ে বাসার ভেতর আসা যায়, তুমি সেই জায়গাটা দেখেছ?'

'দেখেছি তো।'

'দেখেছ, কিন্তু ভালো করে দেখোনি।'

'কীভাবে বুঝলে ভালো করে দেখিনি!'

'ড্রেনের যে ছোট্ট জায়গাটা, ওই জায়গাটায় ভালো করে তাকালে তুমি দেখতে পেতে বিরাট একটা মাকড়সার জাল বোনা আছে সেখানে। সেই জালটা কোনো নতুন জাল না, অনেক পুরনো। জালে অনেকগুলো পোকা মরে ঝুলে ছিল।' রাসাদ একটু থেমে জহিরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার তুমিই বলো—লোকটা যদি সেখান দিয়ে ওই বাসায় ঢুকত এবং সেখান দিয়েই বাসা থেকে পালিয়ে যেত তাহলে কি ওই মাকড়সার জালটা থাকত?'

চোখ দুটো সামান্য বড় করে জহির বলল, 'না, থাকত না।'

'ভেঙে নিঃশেষ হয়ে যেত।' রাসাদ ছোট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসি, মালি আবদুল আজিজের কথায় আসি। তিনি বলেছেন, তিনি নিজ চোখে দেখেছেন টকটকে একটা লাল গেঞ্জি পরে এসেছিল টোকাই ছেলেটা। তুমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলে, বাসার চারপাশে তো অল্প আলোর লাইট জ্বালানো ছিল, ছেলেটার গেঞ্জির কালার দেখলেন কীভাবে তিনি?'

'হ্যাঁ, সেটাই জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'মালি আবদুল আজিজ বলেছিলেন, বাসার চারপাশে অল্প আলো জ্বললেও রাস্তার সবগুলো লাইট তো জ্বলছিল। ড্রেনের পাশেও একটা লাইটপোস্ট আছে, লাইটও আছে সেটাতে।'

'হ্যাঁ, এই কথাই বলেছিল।'

'কিন্তু ড্রেনের পাশের লাইটপোস্টে কোন ধরনের লাইট লাগানো আছে, দেখেছ?' চোখ দুটো একটু কুঁচকিয়ে জিজ্ঞেস করল রাসাদ।

জহির একটু ভেবে বলল, 'না, সেটা তো খেয়াল করিনি।'

'সোডিয়াম লাইট।'

কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল জহির, 'হ্যাঁ, সোডিয়াম লাইটই তো।' জহির আরো একটু উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আর হ্যাঁ, সোডিয়াম লাইটে তো লাল রঙের গেঞ্জি লাল দেখায় না। প্রায় সব রংই কেমন ফ্যাকাসে দেখায়। নিজের গায়ের রংও অন্য রকম দেখায়।'

'তাহলে?'

'মালি আবদুল আজিজ মিথ্যা কথা বলেছেন।'

'হ্যাঁ, তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন।' রাসাদ বিজ্ঞের মতো একটা হাসি দিয়ে বলল, 'মিথ্যা কথা বলেছেন কেয়ারটেকার জমসেরও। তিনি বলেছিলেন, শেষ রাতের দিকে প্রস্রাবের জন্য বাথরুমে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ কাচ ভাঙার শব্দ যায় তার কানে। কিন্তু সেই কাচ ভাঙাটা যে

তাদের বাসাতেই ভাঙা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারেননি তিনি তখন। মালি আবদুল আজিজের চিৎকার শুনে উঠে দেখেন, তাদের বাসারই জানালার কাচ ভাঙা।'

'এ রকমই বলেছিলেন তিনি।' জহির বলল।

'জানালার কাচ যে ভাঙা সেটা তুমিও দেখেছ, আমিও দেখেছি।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'এবার বলো তো, তুমি যদি ঘরের বাইরে থেকে জানালার কাচ ভাঙো, তাহলে সেই কাচগুলো কোথায় পড়বে?'

'কোথায় পড়বে?'

'বাইরে থেকে কাচ ভাঙলে সেই কাচ পড়বে ঘরের ভেতর।'

'কিন্তু ওই বাসার সব ভাঙা কাচ তো বাইরে দেখলাম!'

'হ্যাঁ, বাইরে দেখেছ।' রাসাদ চোখ দুটো একটু বড় করে বলল, 'বাইরে থেকে জানালার কাচ ভাঙলে তো সেই কাচ বাইরে পড়ার কথা না।'

'না, তা পড়ার কথা না।'

'সুতরাং ওই জানালার কাচ ভাঙা হয়েছে ঘরের ভেতর থেকেই।' রাসাদ জহিরের একটা হাত ধরে বলল, 'এবার বলো তো, কারা ঘরের ভেতর থেকে জানালার কাছ ভাঙতে পারে?'

'কারা?'

'যারা ঘরের ভেতর থাকে। বাসার সবাই যেহেতু বেড়াতে গেছে সুতরাং ওই বাসায় ওই ঘরে কারা ছিল, সেটা নিশ্চয় এখন তুমি বুঝতে পারছ?'

কপাল কুঁচকে জহির একটু ঝুঁকে বসল রাসাদের দিকে, 'কিন্তু কাজের বুয়া মর্জিনার ডান হাতটা কাটা দেখেছি যে! যদিও তিনি বলেছেন, শিং মাছ কাটতে গিয়ে বঁটি দায়ের সঙ্গে কেটে গেছে।'

'মর্জিনা মিথ্যা কথা বলেননি। চার নম্বর রোডের তেইশ নম্বর বাসায় সাতিলকে দিয়ে খোঁজ নিয়েছি আমি।'

'চুরি কি তাহলে— ।' কথা শেষ করতে পারল না জহির। তার আগেই রাসাদ বলল, 'তুমি বরং ওই বাসার মালি, দারোয়ান, কেয়ারটেকারকে ভালো করে জিজ্ঞেস কোরো, সব জানতে পারবে। যেহেতু ওটা তোমার এক আত্মীয়ের বাসা, চুরির ব্যাপারটা নিয়ে তোমার ভালো করে তদন্ত করা দরকার। এটাও খেয়াল রেখো, যদি ওই তিনজন বুঝতে পারে যে তারা চুরি করেছে, এটা আবার তুমি টের পেয়েছ, ওরা কিন্তু বাসা রেখে পালাতে পারে তার পরপরই।'

জহির দু'হাত দিয়ে রাসাদের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'তুমি এত কিছু একসঙ্গে বুঝতে পারলে কীভাবে বলো তো?'

'কিছু না। শুধু পড়ে। আমি এত ডিটেকটিভ কাহিনী পড়েছি যে, অনেক কিছুই আমার কাছে সহজ মনে হয়।'

ছাদের সিঁড়ির দিকে শব্দ হতেই ফিরে তাকাল দুজনে। একটা ছেলে দৌড়ে আসছে এদিকে। জহির ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'টমাস, এভাবে হাঁপাচ্ছ কেন! কোনো সমস্যা?'

কিছু বলল না টমাস, মাথা উঁচু-নিচু করল শুধু। জহির ওর একটা হাত খামচে ধরার মতো করে বলল, 'বলো না, কী সমস্যা?'

টমাস বলার আগে আড়চোখে একবার রাসাদের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা টের পেল রাসাদ। উঠে দাঁড়িয়ে সে জহিরকে বলল, 'তোমরা কথা শেষ করো, আমি ছাদের ওই কোনায় গিয়ে দাঁড়াই।'

সাত-আট মিনিট ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকার পর পেছন দিকে ফিরে তাকাল রাসাদ। জহিরের ফর্সা চেহারাটা লাল হয়ে গেছে। ও বুঝতে পারল, ভালো একটা সমস্যায় পড়েছে ওরা। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো ও এদিকে। তারপর জহিরের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'তোমরা যে একটা সমস্যায় পড়েছ, সেটা বুঝতে পারছি আমি। যদি কোনো আপত্তি না থাকে সমস্যাটা বলতে পারো আমাকে। দেখি, কোনো সমাধান দিতে পারি কি না আমি।' চেহারাটা আবার হাসি হাসি করে ফেলল রাসাদ।

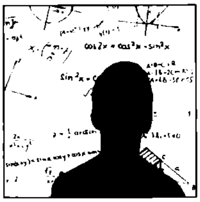

কথাটা শুনেই মাথায় হাত দিল নিলয়। তারপর চোখ-মুখ অন্ধকার করে বলল, 'এখন উপায়, আমার তো কিছুই আসছে না মাথায়!'

'আমাদের মাথায়ও কিছু আসছে না। তুই তো এতক্ষণ তোর প্রাইভেট টিচারের কাছে পড়ছিলি, আর আমরা বিষয়টা নিয়ে ভেবে ভেবে অস্থির।' জাফী সবার দিকে একপলক তাকিয়ে মাথা নিচু করে বলল, 'আমাদের হাতে কোনো টাকা-পয়সাও নেই। সব তো খরচ করে ফেলেছি আমরা।'

'পরশু দিন আমাদের ফাইনাল খেলা। আজ এবং কাল প্র্যাকটিস করা খুবই জরুরি।' সানতুর খুব হতাশার সুরে বলল।

সাদাব এতক্ষণ মাথা নিচু করে কথা শুনছিল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ও বলল, 'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?' সবাই ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালে ও বলল, 'আমরা আর একবার খোরশেদ আঙ্কেলের কাছে যেতে পারি না?'

'না, পারি না।' জাফী কিছুটা শব্দ করে বলল, 'আর একবার ওনার কাছে গেলে উনি আমাদের লাথি দিয়ে বের করে দেবেন।'

'বললেই হলো—।' সাদাব একটু জেদি হয়ে বলল, 'উনি আমাদের পা দিয়ে লাথি মারবেন, আর আমরা বসে থাকব! আমাদের পা নেই!'

'ছি ছি, এটা কী বলছিস তুই, সাদাব!' নিলয় বেশ আপত্তি নিয়ে বলল, 'আমাদের পা আছে মানে কি, আমরাও ওনাকে লাথি মারব?'

'আমি কি তাই বলেছি?' সাদাব দুষ্টু দুষ্টু হাসিতে বলল, 'না, আমরা আমাদের পা দিয়ে দৌড়ে চলে আসব।'

ফিক করে হেসে ফেলল সবাই। কিন্তু নিলয় আগের মতোই গম্ভীর থেকে বলল, 'এ দু'দিন প্র্যাকটিস না করলে আমরা খেলায় জিততে পারব না। প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তখন। গতবার আমরা হেরেছিলাম,

এবার আমাদের টিমটা ভালো, আমরা এবার ভালো করে প্র্যাকটিস করলেই জিতে যাব।' নিলয় মাথার চুলে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'কী যে করি!'

'ভালো কথা— ।' সানতুর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল রাতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তোরা কেউ টের পেয়েছিলি?'

'টের পাব না কেন?' জাফী চোখ বড় বড় করে বলল, 'আমাদের পাশের বাসার আঙ্কেল আর আন্টি তো সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলেছেন।'

'তাই নাকি!' সানতুর আগের মতোই হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু আমাদের পাশের বাসার ইফতি কী বলেছে জানিস?'

'কী বলেছে?' জাফী আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ও আমাকে এসে বলে, সানতুর, কাল রাতে যখন ভূমিকম্প হচ্ছিল তোরা তখন কোথায় ছিলি? আমি বললাম, কেন, আমরা তখন দৌড়ে সবাই বাসার বাইরে গিয়েছিলাম। কারণ যদি বাসাটা ভেঙে পড়ে! তোরা যাসনি? ইফতি তখন ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, না, আমরা বাইরে যাব কেন? আব্বু বলছিল, আমরা ভাড়া বাসায় থাকি, বাসা ভেঙে পড়লেইবা আমাদের কী, না পড়লেইবা কী?'

'বোকা।' নিলয় মেজাজটা খারাপ করে বলল, 'এই ছেলেটা এত বোকা কেন? একেবারে হাবাগোবা। সেদিন এসে আমাকে বলে, নিলয় আমাকে তো তোমরা তোমাদের ক্রিকেট টিমে গতবার নাওনি, এবার কি নেবে? আমি তখন হেসে হসে বলি, আমরা তো কোনো দুষ্টু ছেলে ছাড়া আমাদের ক্রিকেট টিমে কাউকে নেই না। তুমি কি দুষ্টুমি করতে পারো? আজ কি স্কুলে দুষ্টুমি করেছ? ও তখন বলে কি জানিস— ।' নিলয় সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুষ্টুমি করব কখন আমি, আমি তো স্কুলে সব সময় কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি।'

হেসে ওঠে সবাই আবার। তাই দেখে জাফী বলল, 'আমরা তো হাসছি। কিন্তু সমস্যার তো কোনো সমাধান পাচ্ছি না।'

খুব চুপচাপ এতক্ষণ বসেছিল জুহাম। নিলয়দের গ্রুপের মধ্যে জুহাম সবচেয়ে ছোট, কিন্তু সবার ধারণা—বুদ্ধি সবার চেয়ে বেশি ওর। জাফী ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার জুহাম, চুপচাপ বসে আছিস যে!'

আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে জুহাম বলল, 'এতক্ষণ তো তোদের কথা শুনছিলাম।'

'তোর তো অনেক বুদ্ধি, তা কোনো বুদ্ধি এসেছে তোর মাথায়?'

'হ্যাঁ, একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'সত্যি!' সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

সোজা হয়ে বসে জুহাম। সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আমরা এবার খেলব ভিক্টোরিয়া ক্লাবের সঙ্গে। তাই না?'

সানতুর ছোট্ট করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'এর আগেও ওদের সঙ্গে একবার খেলা ছিল আমাদের ক্লাবের। কিন্তু ওদের দু-তিনটা খেলোয়াড় অসুস্থ হওয়ায় ওই টুর্নামেন্টটা বাতিল হয়েছিল। আমরাও এবার বলি, আমাদের কিছু খেলোয়াড় অসুস্থ। পরে আলোচনা করে অন্য একটা দিন খেলব আমরা।'

'মিথ্যা কথা বলব আমরা!' মন খারাপ করে বলল নিলয়।

'এ ছাড়া তো কোনো উপায় দেখছি না।' জুহাম গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই শেষ সময়ে যে আমাদের এ রকম অসুবিধা হবে তা কখনো ভাবিনি।'

'এই কাজটা করলে কেমন হয়— ।' খুব উৎফুল্ল হয়ে জাফি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই থেমে গেল সে। তাদের টিমের ক্যাপটেন জহির, আর এক নম্বর ব্যাটসম্যান টমাস নামছে রিকশা থেকে। সঙ্গে আরো একটা ছেলে।

জহির এগিয়ে গেল ওদের সামনে। ছেলেটার হাত ধরে বলল, 'এ হচ্ছে রাসাদ, সে— ।' কথা শেষ করতে পারল না জহির, তার আগেই সানতুর বলল, 'আজ তোমাদের ক্লাসে ম্যাজিক দেখিয়েছেন ইনি, সেই রাসাদ?'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল সবাই। একে একে রাসাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক শেষ করে সানতুর বলল, 'আমরা সবাই ক্লাস সেভেনে পড়ি, শুধু জহির ভাইয়া ক্লাস এইটে। আপনার কথা আজ সারা স্কুলে আলোচনা হয়েছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' রাসাদ ওদের পাশে বসে বলল, 'আমি তোমাদের সমস্যাটার কথা শুনেছি। শুনে একটা বুদ্ধিও এসেছে আমার মাথায়। যদিও কাজটা একটু কঠিন হবে। তবে করা সম্ভব।'

সবার কঠিন চেহারা একটু একটু হাসিময় হয়ে উঠছে। রাসাদ একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'আচ্ছা, খোরশেদ আঙ্কেল লোকটা এত খারাপ কেন, বলো তো?'

'খারাপ লোকের একটা লিমিট আছে, ওনার কোনো লিমিট নেই।' সানতুর চেহারাটা কঠিন করে বলল, 'আমি এত খারাপ মানুষ কখনো দেখিনি, দেখবও না সম্ভবত কোনো দিন।'

'হ্যাঁ, উনি খুবা বাজে ধরনের লোক।' জুহাম রাগে মুখ লাল করে বলল, 'আমাদের কারোরই কোনো কথা উনি শুনলেন না। কেমন খ্যাঁকখ্যাঁক করে তাড়িয়ে দিলেন আমাদের।'

'পারলে তো আমাদের মারেনই।' নিলয় চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'আমরা একটু ফাঁকে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম ওনার সঙ্গে।'

রাসাদ সবার দিকে আরো একবার ভালো করে তাকিয়ে হেসে ফেলল, 'তোমরা এমনভাবে চোখ-মুখ শক্ত করে আছ, যেন একটু পর ফাঁসি দেওয়া হবে তোমাদের!'

'এটা আমাদের মান-সম্মানের প্রশ্ন, রাসাদ ভাইয়া।' জাফি মাথা নিচু করে বলল, 'আমরা অনেক দিন ধরে আশা করে আছি, ভিক্টোরিয়া ক্লাবের সঙ্গে জিতে একটা বড় ধরনের আনন্দ করব। ওদের টিমের সঙ্গে অনেক টিমই জিততে পারে না।'

রাসাদ হাসতে থাকে। কিছুক্ষণ পর হাসি বন্ধ করে বলল, 'বলো তো, এখন কাদের বাসায় গেলে টিঅ্যান্ডটি ফোনটা কিছুক্ষণের জন্য ফ্রি পাওয়া যাবে!' সবার দিকে তাকাল রাসাদ

'কেন, আমাদের বাসাতেই পাওয়া যাবে।' নিলয় বেশ উৎসাহী হয়ে বলল, 'আব্বু-আম্মু তো এখন কী একটা কাজে বাইরে যাওয়ার কথা। আমি তো বাসা থেকে বের হওয়ার সময় দেখলাম রেডি হচ্ছে, এতক্ষণ তো বোধহয় বেরও হয়ে গেছে বাসা থেকে।' নিলয় একটু থেমে বলল, 'কিন্তু টিঅ্যান্ডটি ফোনের ঠিক কী দরকার?'

'আছে, ভীষণ মজার একটা দরকার আছে।' রাসাদ মুচকি মুচকি হেসে বলল, 'তোমরা সবাই নিলয়দের বাসায় যাও, আমি আর জহির একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসছি।'

'তোমরা আবার কোথায় যাবে?' জাফী কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

'তোমরা যাও, আমরা একটু পরেই আসছি।' রাসাদ উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত ধরে জহিরের। তারপর একটা রিকশা নিয়ে চলে যায় বড় রাস্তাটা বরাবর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সবাই চলে যায় নিলয়দের বাসায়।

বিশ-পঁচিশ মিনিট পর রাসাদ আর জহিরও চলে আসে নিলয়দের বাসায়। তারপর নিলয়দের টেলিফোনটা ওয়ারড্রবের ওপর থেকে নামিয়ে সামনে নিয়ে সবাইকে বলল, 'আমি কথা বলার সময় তোমরা কোনো কথা বলবে না, শুনে যাবে চুপচাপ।'

'কোথায় ফোন করবে তুমি?' সানতুর জিজ্ঞেস করল।

'ফোনে কথা বলা শুরু করলেই তোমরা সেটা বুঝতে পারবে।' রাসাদ টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নাম্বার ডায়াল করার আগে আরেকবার সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড় চার রাস্তার মোড়ে যে নতুন একটা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে, সেখান থেকে নাম্বারটা নিয়ে এসেছি।'

টেলিফোনের নাম্বার ডায়াল করতে থাকে রাসাদ। একটু পর ওদিকে রিং বাজতেই রাসাদ খুক করে কেশে খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা কী অপরাধ দমনবিষয়ক অফিস?'

'জি।' ওপাশ থেকে একজন উত্তর দিলেন।

'একটা জরুরি কথা ছিল।' রাসাদ কথা বলতে বলতে বিশেষ ভঙ্গিমায় আবার সবার দিকে তাকায় আরেকবার। সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে রাসাদের দিকে।

'বলুন।' ওপাশ থেকে অফিসারটি উত্তর দিলেন।

'একটা গোপন খবর বলব আপনাকে।' রাসাদ গলাটা আরো গম্ভীর করে বলল, '২২/২০ নম্বর রোডে খোরশেদ সাহেবের বাসা আছে না, সেই বাসার সামনে ছোট্ট একটা পুকুর আছে। আমরা খবর পেয়েছি সেই পুকুরের নিচে নাকি বেশ বড় বড় কয়েকটা অস্ত্র লুকানো আছে।'

'তাই নাকি!' ওপাশের অফিসারটি বেশ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা কে বলছেন আপনি?'

'আমাকে আপনি চিনবেন না। দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে খবরটা আপনাদের জানানো দরকার, তাই জানালাম।'

'ওকে, নিজেকে গোপন রাখতে চান, নো প্রবলেম। তবে খবরটা আমাদের জানানোর জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ব্যাপারটা দেখছি।'

আধা ঘণ্টার মধ্যে তিন গাড়ি পুলিশ এবং কয়েকজন ডুবুরি এনে অপরাধ দমনবিষয়ক অফিসের অফিসার এসে উপস্থিত খোরশেদ সাহেবের বাসার সামনে। পুলিশগুলো দ্রুত সারা বাড়ি ঘিরে ফেললেন, কিছু পুলিশ দেয়াল টপকে ঢুকে গেলেন বাসার ভেতর। এরই মধ্যে খোরশেদ সাহেব এসে উপস্থিত। বাসার সামনে এবং ভেতরে পুলিশ দেখে তিনি চমকে উঠে এক পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'কী ব্যাপার, এত পুলিশ কেন!'

'গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা খবর পেয়েছি আপনার পুকুরের নিচে বেশ বড় বড় কয়েকটা অস্ত্র লুকানো আছে।' পুলিশ অফিসারটি বললেন।

'বলেন কী!' খোরশেদ সাহেব ভীষণ চমকে উঠলেন।

'না না, আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা আগে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করি।' পুলিশ অফিসারটি খোরশেদ সাহেবকে কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডুবুরিদের ইশারা করলেন পুকুরে নামার জন্য।

পুরো দেড় ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ডুবুরিরা কোনো অস্ত্র খুঁজে পেলেন না। খোরশেদ সাহেব পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছেন। পুলিশ অফিসারটি তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'ডুবুরি দিয়ে তো কোনো কাজ হলো না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যতক্ষণই লাগুক পুরো পুকুরটা সেঁচে ফেলব। দেশের অবস্থা ভালো না। সারা দেশে অস্ত্রের ছড়াছড়ি। যেখানে-সেখানে অস্ত্র ফেলে রাখা যায় না।'

কথাটা শুনে খোরশেদ সাহেব আগের চেয়েও শক্ত হয়ে গেলেন। পুলিশ অফিসারটি হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে করে আনা পাইপ, মোটর ইত্যাদি ফিট করে ফেলল অন্যান্য পুলিশ সদস্য। প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যয় করে তারা সব পানি সেঁচে ফেললেন পুকুর থেকে। কিন্তু আবারও হতাশ হলেন পুলিশ অফিসারটি। না, পুকুরে কোনো অস্ত্র নেই। অবাক হয়ে গেলেন সবাই। পুলিশ অফিসারটি আবার খোরশেদ সাহেবের কাছে গিয়ে কিছুটা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা লজ্জিত এবং দুঃখিত। আমরা যে ইনফরমেশনটা পেয়েছিলাম সেটা আসলে ভুল ছিল।'

গাড়িসহ সব পুলিশ বিদায় নেওয়ার পরও খোরশেদ সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন আগের মতো। বিস্ময়ে তিনি একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি সামনে তাকাতেই দেখেন, সকালে যে ছেলেগুলো এসেছিল তারা আবার এসেছে। তিনি কিছু বলার আগেই রাসাদ একটু

এগিয়ে গিয়ে খোরশেদ সাহেবকে সালাম দিয়ে বলল, ‘পুকুরের এ অবস্থা কেন আঙ্কেল?’

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন খোরশেদ সাহেব। তারপর দাঁত কটমট করে বললেন, ‘কোন বদমাশ যেন পুলিশদের মিথ্যা খবর দিয়েছে এ পুকুরের নিচে নাকি বড় বড় অস্ত্র আছে।’

‘বলেন কী!’ রাসাদ চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, ‘এখানে অস্ত্র আসবে কোথা থেকে?’

‘এটা তো তোমরা বুঝলে, কিন্তু ওই পুলিশ সাহেবরা তো তা বোঝেন না।’ খোরশেদ সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ‘দেখেছ, পুকুরটা সেঁচে কেমন খটমট করে ফেলেছে!’

‘হ্যাঁ, মনেই হচ্ছে না এখানে কোনো পানি ছিল।’ জাফী কথাটা বলতে বলতে এগিয়ে যায় পুকুরটার দিকে। ওর পেছনে পেছনে জুহাম, নিলয়, সানতুর, সাদাব, রাসাদও এগিয়ে যায়। একেবারে কাছে গিয়ে সবার চোখ একসঙ্গে চলে যায় পুকুরের পশ্চিম কোনার দিকে। হ্যাঁ, নতুন ক্রিকেট বলটা ওখানেই পড়ে আছে, সকালে প্র্যাকটিস করার সময় যেটা ডুবে গিয়েছিল এই পুকুরে।

খোরশেদ সাহেবও ওদের পেছনে পেছনে এসেছেন। তিনি গলাটা গম্ভীর করে বললেন, ‘সকালে কিসের জন্য যেন কয়েকবার বিরক্ত করেছ তোমরা আমাকে, কী যেন পড়ে গেছে পুকুরে? পুকুরে তো এখন পানি নাই, দেখো তো সেটা এখন খুঁজে পাও কি না তোমরা।’

খোরশেদ সাহেবের কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুহাম লাফ দিয়ে পুকুরে নেমে ক্রিকেট বলটা হাতে নিয়ে বলে, ‘জি আঙ্কেল, আমরা এটাই খুঁজছিলাম, এটাই পড়ে গিয়েছিল পুকুরে।’

বলটা হাতে নিয়ে ওরা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না পুকুর পারে। প্র্যাকটিস করতে হবে, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। পরশু দিন ফাইনাল খেলা, এবার তাদের জিততেই হবে!

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাসাদকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে সবাই। গল্প বলছে সে, মুগ্ধ হয়ে শুনছে সবাই তা। এত আন্তরিক বন্ধু পেয়ে মুগ্ধ

রাসাদও। টমাসের একটা হাত ধরে বলল, 'তুমি তো এক নম্বর ব্যাটসম্যান। যদি সেঞ্চুরি করতে পারো, তোমাদের স্পেশাল একটা গিফট দেব আমি। আর পুরো টিমের জন্য আছে নতুন একটা চমক।'

দু'হাত দিয়ে রাসাদের একটা হাত চেপে ধরে টমাস বলল, 'তুমি এমনভাবে বলছ, সেঞ্চুরি যে আমাকে করতেই হবে। গিফটের জন্য না, তোমার মতো একজন বন্ধুর কথা রাখতে, সম্মান রক্ষার্থে অনেকগুলো বল মাঠের বাইরে মারতে হবে আমাকে।'

কথা বলতে বলতে কেমন যেন কাতর হয়ে যায় টমাস। রাসাদ মুখটা হাসি করে ফেলল। টমাস আরো কাতর হয়ে বলল, 'একটা অনুরোধ করব তোমাকে, রাখবে?'

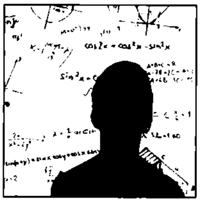

গায়ে ধাক্কা দিয়ে আরাফকে সোজা করল টমাস। ঘুমিয়ে পড়েছিল ও টেবিলের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে। আর ঘুমালেই বেশ শব্দ করে নাক ডাকার অভ্যাস ওর। কিন্তু কেউ ওকে জাগাতে সাহস পায় না কখনো। কারণ ক্লাস সেভেনের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে ও, বদরাগীও।

বিরক্ত হয়ে আরাফ বলল, 'আমাকে এভাবে জাগালি কেন তুই!'

'একটু পর স্যার ঢুকবেন ক্লাসে।'

'ঢুকুক।'

'স্যার যদি জিজ্ঞেস করেন এভাবে ঘুমিয়েছিস কেন, কী বলবি তখন?' টমাস বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'বলব, আমি তো ঘুমাইনি। যেভাবে লোডশেডিং হচ্ছে, চোখ বন্ধ করে অন্ধকার প্র্যাকটিস করছি স্যার।'

টমাস কিছুটা রেগে গিয়ে শব্দ করে বলল, 'তুই এত দুষ্টু কেন বল তো, আরাফ!'

সঙ্গে সঙ্গে আরাফও শব্দ করে বলল, 'তুই এত ভালো ক্রিকেট খেলিস কেন বল তো, টমাস?'

'ভালো খেলি কেন, এর কোনো উত্তর আছে?'

'আমি এত দুষ্টু কেন, এর কোনো উত্তর আছে?'

স্যার ক্লাসে এসে আরাফকে ঘুমাতে দেখলে কী বলবে টমাস আসলে এটা নিয়ে চিন্তিত না। ও চিন্তিত রাসাদ আসবে আজ ওদের ক্লাসে। আরাফকে ঘুমাতে দেখলে ও নিশ্চয় খারাপ কিছু ভাববে। ভাববে, এ ক্লাসের সবাই বুঝি এমন। ব্যাপারটা কেমন একটা বিব্রতকর হবে না!

টেবিলে আবার মাথা ঠেকাতে যাচ্ছিল আরাফ। তার আগেই দরজার দিকে চোখ যায় ওর। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে ও। ছেলেটার কথা স্কুলে আলোচনা হচ্ছে কয়দিন ধরে, দেখেছেও তাকে — নাম রাসাদ।

স্যার ক্লাসে এসে যেখানে দাঁড়ান, আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল রাসাদ। ক্লাসের সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এখন তো অঙ্ক স্যারের আসার কথা ক্লাসে। কিন্তু তার বদলে রাসাদ কেন! সে কি আজ অঙ্ক শেখাবে তাদের!

বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল আরাফ। টমাস হঠাৎ হাত টেনে ধরল ওর। তারপর আবার বসিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'উঠে দাঁড়াচ্ছিস কেন তুই!'

'ওকে কিছু প্রশ্ন করব আমি।' ফিসফিস করে নয়, একটু জোরেই বলল আরাফ, তারপর আবার উঠে দাঁড়াল আবার।

'কী প্রশ্ন করবি তুই?'

'সেটা তোকে বলব কেন আগে?'

কথাগুলো শুনে ফেলল রাসাদ। মুখে চমৎকার একটা হাসি। বলল, 'টমাস, আমার বিশ্বাস, তোমার বন্ধু খুব ভালো কিছু প্রশ্ন করবে আমাকে। প্রশ্নগুলো চমৎকার হবে, আমার উত্তরও নিশ্চয় ভালো হবে।' রাসাদ একটু ঘুরে আরাফের দিকে তাকাল। হাত নেড়ে হাই জানিয়ে বলল, 'তার আগে তোমার নামটা জানতে পারি?'

স্পষ্ট গলায় আরাফ বলল, 'আরাফ।'

'শুধু আরাফ?'

'আরাফ ইয়াসির।'

'আরাফ।' মুখটা আরো হাসি হাসি করে রাসাদ বলল, 'ক্লাসে এসে ঘুমিয়েছিলে তুমি, না?'

বেশ চমকে উঠল আরাফ। অবাক স্বরে বলল, 'আমি যে ক্লাসে ঘুমিয়েছি, কী করে বুঝলে তুমি?'

'তোমার কপালে লম্বা একটা দাগ ভেসে আছে। সাধারণত কোথাও মাথা ঠেস দিয়ে রাখলে এমন দাগ হয়। টেবিল ছাড়া এখানে মাথা ঠেস দেওয়ার তো কোনো কোনো জায়গা দেখছি না আমি। তাছাড়া তোমার চোখ দুটোও বেশ ঘুম ঘুম।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'রাতে ঘুমাওনি কেন আরাফ?

'কম্পিউটারে গেম খেলেছি অনেক রাত পর্যন্ত।'

'গেমস খেলা খুব খারাপ কিছু না, তবে বেশি খেলা খারাপ।' রাসাদ আরাফের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলল, 'কম্পিউটার খুব ভালো

একটা জিনিস। কিন্তু আমাদের জীবনটাই যদি কম্পিউটার হতো, তাহলে কেমন হতো, বলো তো আরাফ?'

কিছু না ভেবেই আরাফ বলল, 'কেমন হতো?'

'ধরো কারো ভালো কিছু দেখে ভালো লাগল তোমার, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড করতে পারতে তুমি তাকে; অনেক দিন মেশার পর কোনো বন্ধুর খারাপ কিছু দেখে ভালো লাগছে না আর তাকে, তখন ডিলিট করে দিতে পারতে তুমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে।'

'খুব মজা তো!'

'আবার কেউ তোমাকে বিরক্ত করছে, সহ্য হচ্ছে না তোমার তাকে; তাহলে তাকে তুমি রিসাইকেল বিনে রেখে দিতে পারতে, দরকার হলে আবার রি-স্টোর করতে পারতে সময়মতো।'

কিছুটা লাফিয়ে ওঠার মতো দাঁড়িয়ে আরাফ বলল, 'অদ্ভুত তো!'

'মাঝে মাঝেই অনেক প্রিয় জিনিস হারিয়ে যায় আমাদের। ধরো, তোমার কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পাচ্ছ না তুমি, তখন তোমার সময় নষ্ট করতে হতো না। ফাইন্ড বাটনে চাপ দিলেই খুঁজে পেতে তুমি সেই জিনিসটাকে।'

'তাই তো!' মুখ হাঁ করে হাসছে আরাফ।

'ব্যায়াম কিংবা মর্নিংওয়াক করতে বরাবরই অলস লাগে আমাদের। জীবনটা যদি কম্পিউটার হতো তাহলে রান বাটনে চাপ দিলেই বিরক্তিকর মর্নিংওয়াকটা সেরে নেওয়া যেত আমাদের প্রতিদিন।'

'একদম ঠিক।'

'যদি কেউ চিৎকার করে গোলমাল শুরু করত কিংবা রাজনীতিবিদের মতো শব্দ করে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিত, তবে তার স্পিকারটা বন্ধ করে দিলেই ফিনিশ হয়ে যেত সব।'

শব্দ করে হেসে ওঠে আরাফ।

'হঠাৎ হঠাৎ অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করে আমাদের, বাসায় সেটা থাকে না তখন। ওই জিনিসটা নাম লিখে সেন্ড নাও বাটনে ক্লিক করলেই আপনাআপনি সামনে এসে হাজির হতো জিনিসটা।'

'উহ্, জীবনটা যে কত মজার হতো!'

'জীবনটা কিন্তু আসলে মজারই। কিন্তু মাঝে মাঝে বিভিন্ন সমস্যা এসে মন খারাপ করে দেয় আমাদের। জীবনটা যদি কম্পিউটার হতো তাহলে নতুন করে সেট আপ দেয়া যেত জীবনটাতে, তখন অনেক সমস্যাকেই পাশ

কাটানো যেত। নতুনভাবে জীবন শুরু করা যেত।' গম্ভীর হয়ে এতক্ষণ কথা বলছিল রাসাদ। হাসতে শুরু করে সে হঠাৎ। হাসতে হাসতেই আরাফকে বলল, 'কম্পিউটার আসার আগেও আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করতাম। সেগুলোর মানে কিন্তু অন্য রকম ছিল। যেমন মেমোরি। মেমোরি বলতে আমরা আগে এমন কিছু বুঝতাম, যা আমরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হারাই। অ্যাপ্লিকেশন বলতে বুঝতাম স্কুলের হেড স্যারের কাছে লেখা ছুটির দরখাস্ত বা কোথাও চাকরির দরখাস্ত।'

আরাফ হঠাৎ হাততালি দেওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, 'প্রোগ্রাম বলতে টেলিভিশনের কোনো শোকে বুঝতাম।'

'রাইট।' রাসাদ ছোট্ট করে হাততালি দিয়ে আরাফের হাততালির উত্তর দিয়ে বলল, 'কি-বোর্ড বলতে পিয়ানোর কি-বোর্ডকে বুঝতাম। ওয়েব বলতে বুঝতাম মাকড়সার বাসাকে।'

'ভাইরাস বলতে বুঝতাম সেই আণুবীক্ষণিক জীবকে, যা ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য দায়ী।' আরাফ বেশ ভঙ্গিমা করে বলল।

'হার্ড ড্রাইভ বলতে বুঝতাম লম্বা ভ্রমণকে। মাউস—।' রাসাদকে থামিয়ে আরাফ খুব দ্রুত গতিতে বলল, 'মাউস প্যাড বলতে বুঝতাম পোষা ইঁদুরের বিছানাকে।'

রাসাদ একটু থেমে ভালো করে আরাফের দিকে তাকাল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আরাফ, তোমাকে খুব বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে আমার।' রাসাদ একটু থামল। তারপর আরাফের দিকে কৌতুক মিশ্রিত চাহনি দিয়ে বলল, 'সংজ্ঞা কাকে বলে জানো তো?'

মাথা কাৎ করে আরাফ বলল, 'জানি—কোনো কিছু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে সংজ্ঞা বলে।'

'কম্পিউটারসংক্রান্ত যেমন কিছু শব্দ আছে, তেমনি প্রচলিত অথচ পুরনো কিছু শব্দও আছে আমাদের। নতুন করে যাদের সংজ্ঞা বলতে পারি আমরা। যেমন বাবা। বাবার সংজ্ঞা কী? বাবা হচ্ছে তিনিই, যিনি প্রকৃত প্রদত্ত ব্যাংকার, যার কাছে যখন-তখন টাকা চাওয়া যায়।' রাসাদ হাসতে হাসতে বলল, 'কী, ঠিক?'

বাম পাশ থেকে অল্প স্বাস্থ্যের একটা ছেলে বলল, 'বাবা হচ্ছেন তিনিও, যার পকেট থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়লে কখনো জেলে যেতে হয় না।'

'ভেরি গুড।' রাসাদ ছেলেটির দিকে তাকাল, 'তোমার নাম কী?'

'নীরব।'

'চমৎকার করে বলেছ তুমি নীরব। তোমাকে থ্যাঙ্ক ইউ।' রাসাদ সবার দিকে একপলক তাকাল, 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ সুবিধাবাদীর সংজ্ঞা দিতে পারবে?'

'পারব।' পেছন থেকে চশমা পরা একটা ছেলে হাত তুলে বলল, 'সুবিধাবাধী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি নদীতে পড়ে গেলে গোসলটা সেরে তারপর নদী থেকে ওঠেন।'

'রাইট।' রাসাদ বেশ মুগ্ধ হয়ে বলল, 'তোমাদের মধ্যে কে কে গল্প-উপন্যাস পড়ো বা পড়তে পছন্দ করো?'

ক্লাসের অর্ধেকের বেশি ছেলে হাত তুলল। রাসাদ আগের মতোই মুগ্ধ হয়ে বলল, 'অনেকেই বলেন ইদানীং নাকি ছেলে-মেয়েরা বই পড়ে না, পড়তে পছন্দ করে না। এখন মনে হচ্ছে, ঠিক না কথাটা। আমি মনে করি, মানুষ আগের চেয়ে আরো বেশি বই পড়ে। কিন্তু তোমরা কি বলতে পারবে ক্ল্যাসিক উপন্যাস কাকে বলে?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না। রাসাদ আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'সবাই যে উপন্যাসটা কিনে না পড়েই ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখে এবং ওই উপন্যাস নিয়ে কোনো কথা উঠলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।'

'একদম ঠিক কথা।' পেছন থেকে একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার এক খালু আছেন, যিনি মোটা মোটা বই কিনে তার ড্রইংরুমের আলমারি ভরে ফেলেছেন, দুটো বুক সেলফও ভরে ফেলেছেন। কিন্তু একটা বইও পড়তে দেখিনি তাকে কখনো।'

রাসাদ মুচকি হেসে বলল, 'তোমরা সবাই নিশ্চয় চিকেন ফ্রাই পছন্দ করো। কী ঠিক?'

ক্লাসের সবাই একসঙ্গে দ্রুত হাত তুলে বলল, 'খুব খুব।'

'চিকেনের বাংলা তো মুরগি। তাই না?'

'হ্যাঁ।' সবাই বলল।

'এবার বলো তো, মুরগি কাকে বলে?'

'মুরগি আবার কাকে বলে?' হতাশার স্বরে পেছন থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মুরগি তো মুরগিই।'

'হ্যাঁ, আমরা সকলেই জানি মুরগি তো মুরগিই। কিন্তু আমি তো প্রথমেই বলেছি পুরনো কিছু শব্দ আছে আমাদের কিন্তু নতুন করে তার সংজ্ঞা বলতে পারি আমরা।' রাসাদ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুরগি কাকে বলে আমিই বলি—মুরগি হচ্ছে সেই প্রাণী, যাকে আমরা জন্মানোর আগে যেমন খাই, তেমনি খাই মৃত্যুর পরেও।'

ডান পাশের কোনা থেকে চিৎকার করে একজন বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো! মুরগির আগের অবস্থা হচ্ছে ডিম, সেটা আমরা খাই। সেই ডিম যখন মুরগি হয়ে যায়, তখন তাকে খাই জবাই করে। খুব চমৎকার!'

দ্বিতীয় বেঞ্চ থেকে ফর্সামতো একটা ছেলে বলল, 'শুধু মুরগি না; হাঁস, কোয়েল পাখি এসবের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রযোজ্য।'

রাসাদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক।' রাসাদ আবার সবার দিকে তাকাল, 'এবার বলো তো, জীবন বীমা কাকে বলে?'

ঝট করে এবার আরাফ হাত তুলল, 'জীবন বীমা হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার, যেখানে তুমি সারা জীবন গরিব থেকে মৃত্যুর পর ধনী হবে।'

শব্দ করে হাততালি দিল রাসাদ, 'খুব সুন্দর বলেছ তুমি। আমার একটা ধারণা ছিল মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি কমে যাচ্ছে। এ ক্লাসের সবাইকে তো বটেই, অন্তত তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, না, আমার ধারণাটা ঠিক না।' রাসাদ হাত বাড়াল সামনের দিকে। এক হাতে আরাফ, আরেক হাতে টমাসকে জড়িয়ে ধরে বুজে ফেলল চোখ দুটো। সঙ্গে সঙ্গে সাতিলের চেহারাটা ভেসে উঠল চোখে। কষ্ট হলো একটু বুকের ভেতর। মনে মনে বলল, প্রিয় সাতিল, যার জন্য তুই এত অস্থির হয়ে আছিস, কষ্ট পাচ্ছিস; দেখিস, সেটা থাকবে না। কিছুতেই থাকবে না। প্রমিজ।

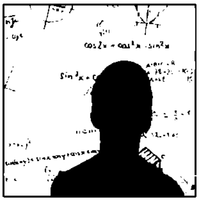

ঘরের ভেতর টুক করে শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল রাসাদের। অন্ধকার ঘর, একপলক চোখ খুলেই বন্ধ করে ফেলল আবার। ভাবল, কোনো ইঁদুর-টিদুর হবে। ঘরের ভেতর দৌড়াচ্ছে, শব্দ হচ্ছে তাই।

মিনিটখানেক পর শব্দটা আবার হলো, আগের চেয়ে একটু জোরেই হলো। চোখ খুলল না এবার রাসাদ, কিন্তু কান দুটো সজাগ করে রাখল। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল, শব্দ হচ্ছে না আর কোনো।

চোখ বুজেই শুয়ে রইল রাসাদ। কান আগের মতোই সজাগ। কিন্তু সত্যিই আর কোনো শব্দ হলো না। পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিল সে। শব্দটা আবার শোনা গেল তখন। চোখ না খুলেই নিঃশব্দে হাত বাড়াল একটু। সাতিল তার পাশেই শুয়েছিল, এখন নেই। বুকের ভেতরটা সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়ে উঠল রাসাদের।

চোখ দুটো আলতো করে খুলে ফেলল রাসাদ। কোনোরকম নড়াচড়া না করে শুয়ে থেকেই বোঝার চেষ্টা করল অবস্থাটা। সারা ঘর নিকষ অন্ধকার, মাথাটাও একদিকে কাত হওয়া, বোঝা যাচ্ছে না তাই কোনো কিছুই।

শব্দটা আবার হলো, এবার একটু অন্য রকম শব্দ। রাসাদের মনে হলো ঝট করে উঠে বসবে সে। ডান পাশের দেয়ালে লাইটের সুইচ, দ্রুত সেখানে হাত নিয়ে লাইটটা জ্বালাবে। কিন্তু সে তা করল না। শুয়ে রইল আগের মতোই—চুপচাপ, স্থির।

শুয়ে শুয়েই ভাবতে লাগল রাসাদ। যদি ঘরের ভেতর কেউ ঢুকেই থাকে, তাহলে বিছানায় উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা যেখান দিয়ে ঘরে ঢুকেছে বেরিয়ে যাবে সেখান দিয়ে। তখন আর জানা যাবে না কে ঢুকেছিল ঘরে। কী জন্য ঢুকেছিল, জানা যাবে না তাও। আচ্ছা, কেউ না হয় ঘরে ঢুকেছে, কিন্তু সাতিল গেল কোথায়! ঘরে ঢুকেছে যে মানুষটা, ঘুমন্ত সাতিলকে নিয়ে পালাচ্ছে না তো সে!

বুকের ভেতর আবার মোচড় দিয়ে উঠল রাসাদের। চুপ করে শুয়ে থেকেই আরো কিছুক্ষণ ভাবল সে। কিন্তু মাথায় কিছু আসছে না এ মুহূর্তে। কী করা উচিত এখন, মাথায় আসছে না সেটাও। আরো কিছুক্ষণ সেভাবেই শুয়ে রইল সে।

রাসাদ টের পেল লাফালাফিটা বেশি শুরু হয়েছে বুকের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ঘুমানোর সময় পাশে একটা কিছু নিয়ে ঘুমানো উচিত। মাঝারি গোছের কোনো ছুরি হতে পারে সেটা কিংবা দু-তিন ফুট লম্বা শক্ত একটা লাঠি হতে পারে অথবা আত্মরক্ষার জন্য কোনো একটা কিছু খুবই জরুরি। ঘরের ভেতর যে লোকটা হাঁটাহাঁটি করছে, যার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, এই মুহূর্তেই যদি সেই মানুষ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার শরীর কিংবা মুখ চেপে ধরে, তাহলে কী করতে পারবে সে! রাসাদ একটু ভালো করে ভাবল—কিছুই করার নেই তার, কোনো কিছুই করতে পারবে না সে। সামান্যতম বাধা দেওয়াও সম্ভব না।

মড়া মানুষের মতো আরো কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে রইল রাসাদ। মাথায় বুদ্ধিদীপ্ত কোনো ভাবনাই আসছে না। বিপদের সময় অনেক মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়, তারও কি পেল? কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমানদের পায় না। তবে কি সে প্রকৃত বুদ্ধিমান হতে পারেনি! এলোমেলো ভাবনা আসতে লাগল মাথায়, কিন্তু কোনো আসল বুদ্ধি আসছে না। নিঃশব্দে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রাসাদ।

মনের ভেতর হঠাৎ রাগ সৃষ্টি হলো রাসাদের। তার মনে হলো—দ্রুত খাট থেকে নেমে লোকটাকে জাপটে ধরে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারবে। পরক্ষণেই ভাবল—লোকটা তো ঘরের ভেতর খালি হাতে নাও আসতে পারে। হাতে কোনো ধারালো ছুরি কিংবা অন্য কোনো অস্ত্রও থাকতে পারে। ব্যাপারটা তখন ভয়ানক হতে পারে।

রাসাদ হঠাৎ আলতো করে কাৎ হলো এদিকে। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে পাশ ফিরে শুয়েই চোখ খুলে ফেলল সে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না ঘরের ভেতর। ভাবল, হঠাৎ চোখ খোলার জন্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরও কিছুই দেখতে পেল না সে।

হঠাৎ জানালার দিকে চোখ গেল রাসাদের। জানালা খোলা। পাশের বাসায় জ্বালানো লাইটের সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। একটু পরিষ্কার জায়গাটা। কিন্তু আশপাশটা বেশ অন্ধকার, কালো।

অন্ধকারের দিকে ভালো করে তাকাতেই চমকে উঠল রাসাদ। জানালার ডান পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে দাঁড়িয়েই জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে বাইরে। কিন্তু সে এমনভাবে উঁকি দিচ্ছে, যেন বাইরে থেকে তাকে কেউ দেখতে না পায়। খুব সাবধানতা নিয়ে কাজটা করছে সে।

কোনোরকম শব্দ না করে বিছানায় উঠে বসল রাসাদ। অন্ধকারটা সয়ে আসছে একটু। জানালার সামান্য আলোতেও আশপাশটা অল্প অল্প আলো হয়ে উঠেছে। পাশের মানুষটার দিকে ভালো করে তাকাল সে। চমকে উঠল আবার। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না। আরো একটু ভালো করে তাকাতেই অবিশ্বাসটা দূর হয়ে গেল। হ্যাঁ সাতিল, সাতিলই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘ একটা বাতাস বের করে দিল রাসাদ। এতক্ষণ যে আতঙ্ক নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল, সেটা দূর হতেই প্রচণ্ড অবাক হওয়ার পালা শুরু হলো—সাতিল ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছে? এত রাতে ও জানালার পাশে কেন? চুপিচুপি উঁকি দিয়ে বাইরে ও কী দেখার চেষ্টা করছে? মাথার ভেতর অনেকগুলো প্রশ্ন জেগে উঠল তার।

বিছানায় যে উঠে বসেছে রাসাদ, ব্যাপারটা টের পায়নি সাতিল। ও আগের মতোই একটু একটু পর উঁকি দিচ্ছে জানালা দিয়ে। কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে বাইরে।

সাতিলের চেহারাটা উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে। খুব কঠিন চেহারা করে দাঁড়িয়ে আছে ও জানালার পাশে। ঘরের ভেতর যে একজন আছে, সেটা খেয়ালই নেই তার।

হঠাৎ হাসি পেল রাসাদের। এতক্ষণ সে যা ভেবেছিল, তার কিছুই না। ঘরের ভেতর সাতিল; নড়াচড়া করছে, শব্দ হচ্ছে। এতক্ষণ কত কিছুই না ভাবল সে।

আলতো করে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল রাসাদ। বিছানায় বসে থেকে সে যদি সাতিলকে ডাক দিত, তাহলে চমকে উঠবে সাতিল। তাই শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করল প্রথমে। তারপর খুক করে একটু কাশির শব্দ করল সে। চোখ দুটো সামান্য খুলে সাতিলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার চেষ্টা করল। সাতিল ঘুরে তাকিয়েছে বিছানার দিকে। রাসাদ আবার একটু কাশি দিয়ে চোখ দুটো খুলে ফেলল পুরোপুরি। বাথরুমে যাবে এমন ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসল। পাশ ফিরে সাতিলকে দেখতে না পেয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে কিছুটা অবাক গলায় বলল, 'সাতিল, এত রাতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কী করছিস? কখন উঠেছিস ঘুম থেকে তুই?'

কিছুটা চমকে উঠল সাতিল। জানালার পাশ থেকে দ্রুত বিছানার দিকে এগিয়ে এলো সে। রাসাদের পাশে বসে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কিছুক্ষণ আগে একটা শব্দ শুনেছ তুমি?'

ডান পাশের দেয়ালে হাত নিয়ে লাইট জ্বালাল রাসাদ। তারপর সাতিলের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কীসের শব্দ?'

'ঘুমিয়ে ছিলাম আমি। হঠাৎ শুনতে পেলাম জানালার পাশে একটা চোর শব্দ করছে। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে ওখানে গিয়ে দেখি, কেউ নেই। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি জানালার আড়ালে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না এখনো।'

সাতিলের কাঁধে একটা হাত রাখল রাসাদ, 'আমার মনে হয় তুই কোনো চোরের শব্দ শুনিসনি।'

'তোমার এই কথা মনে হওয়ার কারণ?'

'কারণটা হচ্ছে এই—তোর আম্মু আর তোকে সেদিন বলেছিলাম, জানালায় একটা চোর দেখেছি আমি।'

'হ্যাঁ, বলেছিলে তো। রাতে দু'হাতে জানালার গ্রিল চেপে ধরে তাকিয়েছিল আমার ঘরের ভেতর।'

'তারপর থেকে তোর মনে হতে লাগল—চোরটা আবার আসবে। আজ তাই কোনো একটা কারণে শব্দ হতেই সেই চোর দেখার জন্য জানালার পাশ গিয়ে দাঁড়িয়েছিস তুই।'

'ওটা যে চোরের শব্দ ছিল না, সেটা কী করে বুঝলে তুমি?'

'কারণ কোনো চোর সাধারণত বাথরুমের পাইপ বেয়ে এই তিনতলার জানালার পাশে এসে দাঁড়াবে না, যে জানালাটা খোলা থাকলেও শক্ত গ্রিল আছে যেখানে। ঘরে ঢুকতে হলে তাকে গ্রিল কাটতে হবে, গ্রিল কাটতে গেলেই শব্দ হবে। নিঃশব্দ রাতে তো আরো বেশি শব্দ হবে।'

'তাহলে তুমি যে বললে সেদিন আমার জানালার পাশে চোর এসে দাঁড়িয়েছিল!' সাতিল চোখ-মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

'মিথ্যা কথা বলেছি আমি।'

'মিথ্যা কথা বলেছ তুমি!'

'হ্যাঁ।' রাসাদ সাতিলের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'এই মিথ্যা বলার একটা কারণ আছে। যেদিন তোদের বাসায় আসলাম, সেদিন বিকেলে বাজারের পাশে যে বড় মার্কেটটা আছে, সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, আমার বয়সী কিংবা আমার চেয়ে একটু বড় ছেলেকে কয়েকজন মেরে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের করে ফেলেছে।'

'কেন?'

'কী নাকি একটা চুরি করেছিল ছেলেটা। ব্যাপারটা দেখে এত খারাপ লাগল আমার। নতুন এসেছি এখানে, কেউ আমাকে চেনে না, তাই কিছু বলতেও পারছিলাম না।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'নাকে-মুখে রক্ত নিয়ে ছেলেটা যা কাঁদছিল! তোর মা আর তোকে মিথ্যা বলার কারণ, সেদিন তোদের পেছনের বাসায় যে চিৎকার হলো, ওই চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় আমার। সকাল হয়ে গেছে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে চিৎকার শুনে মনে হলো—কিছু একটা চুরি হয়েছে ওই বাসায়। একটা চোর কিছু একটা চুরি করেছে। একটা চোর কিন্তু কোনো গরু-ঘোড়া বা ছাগল-ভেড়া না—মানুষ। যে খুব সামান্য কিছু চুরি করেছে। কিন্তু তুই কি জানিস—প্রতিদিন কত বড় বড় চুরি হচ্ছে। সরকারি টাকা চুরি হচ্ছে, আমাদের জনগণের টাকা চুরি হচ্ছে, কত ধরনের সম্পদ দখল করা হচ্ছে। এসব যারা করছে তারা কিন্তু ওই রকম ছিঁচকে চোর না। তারা বড় বড় মানুষ, যাদেরকে আমরা সম্মান করে কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম দেই।'

'তোমার কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে মামা।'

'মানুষ আজকাল খুব অমানবিক হয়ে গেছে রে! একটা কিছু হলেই একে অন্যকে কুপিয়ে মারছে, পিটিয়ে মারছে, মেরে ফেলে টুকরো টুকরো করছে। ব্যাপারটা ভাবতেই গা কেমন গুলিয়ে ওঠে। একটা মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষকে রক্তাক্ত করে কীভাবে!' রাসাদ গলাটা দুঃখী দুঃখী করে বলল, 'আমার একটা ইচ্ছে আছে, জানিস?'

'কী ইচ্ছে মামা?'

'একটা মানুষ অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করা যাবে না, আগে তার কথা শুনতে হবে, তারপর যা শাস্তি হয়, তা-ই দিতে হবে। এটা না করে কেউ হঠাৎ আঘাত করলে তার বিচার হওয়া উচিত আগে—এই ব্যাপারটি সবার মাঝে জাগিয়ে তোলা।'

'খুব সুন্দর ইচ্ছে মামা।' সাতিল রাসাদকে কিছুটা জড়িয়ে ধরার মতো করে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি মামা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ভালো কথা—।' রাসাদ সাতিলের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'তোদের স্কুলের যে কাজের জন্য আমি এখানে এসেছি, সেটার অনেকটা গুছিয়ে এনেছি। আশা রাখি দু-তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে পারব ব্যাপারটা।'

'সত্যি!' সাতিল আনন্দে লাফিয়ে উঠল বিছানার ওপর। রাসাদ ওর হাত ধরে বিছানার ওপর আবার বসিয়ে বলল, 'তোদের স্কুলে একটা ছেলে আছে না, মায়াজ নাম।'

'হ্যাঁ, আছে তো। খুব খারাপ ছেলে। কেউ ওর সঙ্গে মেশে না।'

'ওকে সবাই খারাপ বলে কেন জানিস?'

'তা জানি না।'

'এই খারাপ ছেলেটার অদ্ভুত একটা গুণ আছে, তা তোরা কেউ জানিস না। তোদের স্কুলের সবাইকে জানাব আমি ব্যাপারটা।' সাতিল অবাক হয়ে রাসাদের কথা শুনছে। ওর কাঁধে হাত রেখে রাসাদ আরো বলল, 'কাউকে এমনি এমনি খারাপ বলা ঠিক না।'

'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না মামা।'

'এখন না, পরে তোকে বুঝিয়ে দেব।' জানালার দিকে তাকাল রাসাদ, 'সকাল হতে তো আর দেরি নেই। একটু পরে সূর্য উঠবে। বল তো, কত দিন আগে সকালে সূর্য ওঠা দেখেছিস তুই?'

সাতিল লজ্জা পেয়ে বলল, 'মনে নেই মামা।'

'অথচ সূর্য ওঠার মতো এত চমৎকার দৃশ্য খুব কম আছে।' সাতিলের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রাসাদ, 'চল, জানালার পাশে দাঁড়াই। আজ দুজন একসঙ্গে সূর্য ওঠা দেখব।'

জানালার পাশে এসে দাঁড়াল দুজন। হঠাৎ হালকা একটা বাতাস এসে লাগল ওদের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে সাতিলের মনে হলো, ভোরের এত চমৎকার বাতাস কত দিন অনুভব করেনি সে!

রাস্তার ওপাশের বড় আমগাছটাতে অনেকগুলো পাখি ডাকতে শুরু করেছে। কান পেতে খুব মনোযোগ দিয়ে শব্দগুলো শুনছে দুজন।

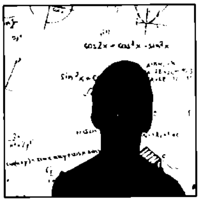

সাতিল উত্তেজনায় লাফাচ্ছে। তার ছোট মামা রাসাদ আসবে আজ তাদের ক্লাসে। ক্লাসের অন্য ছাত্ররাও সেটা জানে। কিন্তু ক্লাসের কেউ জানে না রাসাদ সাতিলের মামা।

ক্লাস সিক্সের সব ছাত্র অবশ্য রাসাদ সম্বন্ধে এর আগে শুনেছে, কিন্তু কেউ দেখেনি তাকে। এর আগে ক্লাস এইট এবং ক্লাস সেভেনে গিয়েছিল সে, তাকে পেয়ে নাকি ভীষণ মজা পেয়েছে তারা। ক্লাস সিক্সের সবার বিশ্বাস—আজ তারাও অনেক মজা পাবে।

ক্লাস সিক্সের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ছেলে হচ্ছে পলাশ। একসঙ্গে চার-পাঁচটা সিঙ্গারা খেতে পারে ও। ও যে বেঞ্চে বসে সেই বেঞ্চে পাঁচজন বসতে পারে না, চারজন বসতে হয়।

পেছনের দিকের বেঞ্চ থেকে উঠে এসে সামনের দিকে আসছিল পলাশ। দুই সারির বেঞ্চের মাঝ দিয়ে উত্তেজনায় পায়চারি করছিল সাতিল। কিন্তু সারির মাঝখানে পলাশকে দেখে থেমে গেল হঠাৎ। পলাশ মাঝখানে দাঁড়ানোতে যেতে পারছে না সে, পলাশও সরে দাঁড়াচ্ছে না। সাতিল বেশ বিরক্ত নিয়ে বলল, 'রাস্তার মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়েছিস কেন তুই!'

'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

সাতিল বিরক্তি নিয়েই বলল, 'বল।'

'শুনেছি, আজ যে ক্লাসে আসবেন, তিনি নাকি জাদু জানেন। তিনি কি জাদু দিয়ে খাবার বানাতে পারেন? এই যেমন সিঙ্গারা, সমুচা, চানাচুর?'

'সম্ভবত না।'

'তাহলে আর কীসের জাদুকর হলেন তিনি!'

'তোর কি সিঙ্গারা-সমুচা খেতে ইচ্ছে করছে এখন?'

'এখন কেন, আমার তো সব সময় খেতে ইচ্ছে করে।'

সাতিল এতক্ষণ এ সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিল। পলাশের একটা হাত ধরে বলল, 'ঠিক আছে, মামাকে বলব তোর কথা। তার আগে চল, স্কুলের সামনের ওই হোটেল থেকে দুজন দুটো সিঙ্গারা খেয়ে আসি।'

দু'কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল পলাশের। সাতিলের হাত ধরেই ক্লাসের বাইরে চলে এলো ও দ্রুত। কিন্তু স্কুলের গেটের কাছে এসেই থেমে গেল সাতিল। পলাশের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার টাকা তো আমার স্কুল ব্যাগের ভেতর, তুই এখানে একটু দাঁড়া। আমি দৌড়ে গিয়ে টাকা নিয়ে আসি।'

সাতিল আর পলাশ পাশাপাশি বসেছে, ওদের ব্যাগ দুটোও পাশাপাশি। সাতিল দৌড়ে ক্লাসে ঢুকেই প্রথমে নিজের ব্যাগ থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করল, তারপর কেউ দেখে ফেলার আগেই ওই প্যাকেটটা ঢুকিয়ে দিল পলাশের ব্যাগে। চেইন ভালো করে আটকিয়ে, ব্যাগ দুটো আগের মতো সোজা করে রেখে, বের হয়ে এলো আবার ক্লাস থেকে।

দ্রুত দুটো সিঙ্গারা খেয়ে ক্লাসে ফিরে এলো আবার দুজন। স্কুল মাঠের মাঝখানে এসেই তারা দেখতে পেল, লাইব্রেরি রুমের পাশ দিয়ে সিক্সের ক্লাস রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাসাদ। তার আগেই দৌড়ে ক্লাস রুমে ঢুকল ওরা।

কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ নিয়ে ক্লাস সিক্সের রুমে পা রাখল রাসাদ। ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে স্যারের টেবিলে রেখে হাসি হাসি চেহারা করে সবার দিকে তাকাল। তারপর ব্যাগ থেকে বড় একটা সাদা কাগজের প্যাকেট বের করে বলল, 'এখানে ঊনত্রিশটা সমুচা আছে। কিন্তু তোমাদের ক্লাসে ছাত্র আছে কতজন?'

সাত-আটজন ছেলে শব্দ করে বলল, 'ত্রিশজন।'

'আজ তো ত্রিশজনই এসেছে, না?'

সবাই বলল, 'হ্যাঁ।'

'ইশ, তাহলে একটা সমুচা কম পড়ে গেল!' রাসাদ সামনে থেকে পেছনের বেঞ্চগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, কোনো অসুবিধা নেই। প্রতিটা ক্লাসে দু-একজন ছাত্র থাকে যারা খেতে খুব পছন্দ করে। আমার মনে হয় এই ক্লাসে খেতে সবচেয়ে পছন্দ করে—।' রাসাদ পলাশের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'তুমি।'

মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল পলাশের। ক্লাসের বাকি ছাত্ররা চিৎকার করে বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে বড় খাদক হচ্ছে পলাশ।'

রাসাদ পলাশকে বলল, 'তোমার নাম পলাশ?'

পলাশ হাসতে হাসতেই বলল, 'হ্যাঁ।'

'পলাশ, আমি আগেই বলেছি এখানে ঊনত্রিশটা সমুচা আছে, একটা কম আছে। পলাশ, তুমি বরং কাজ করো। তোমার স্কুল ব্যাগের ওপর ডান হাতটা রাখো। তারপর বলো — মজাদারং একটাং সমুচাং ব্যাগেং আসোং।'

কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে নিজের স্কুল ব্যাগের ওপর হাত রাখল পলাশ। তারপর তোতলানোর ভাব নিয়ে থেমে থেমে বলল, 'মজাদারং একটাং সমুচাং ব্যাগেং আসোং।'

সবার দিকে তাকিয়ে রাসাদ বলল, 'তোমাদের কি বিশ্বাস হয় পলাশের ব্যাগে একটা মসুচা এসেছে?'

অধিকাংশই বলল, না। কেউ কেউ অবিশ্বাসী স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

রাসাদ পলাশের দিকে তাকাল, 'পলাশ তোমার কি মনে হয় একটা সমুচা তোমার ব্যাগের ভেতর এসেছে?'

ব্যাগের চেইন খুলতে যাচ্ছিল পলাশ। তার আগেই রাসাদ বলল, 'না, আগেই ব্যাগ খুলবে না। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমি কিছু বলতে পারছি না।' মাথার পেছনে হাত নিয়ে চুলকানোর ভঙ্গি করে বলল পলাশ।

'ঠিক আছে কিছু বলতে হবে না তোমাকে, তুমি বরং তোমার ব্যাগটাই খুলে ফেলো।' পলাশের দিকে একটু এগিয়ে গেল রাসাদ।

ব্যাগের চেইন খুলে ভেতরে হাত ঢোকাল পলাশ। একটু পর কাগজের একটা প্যাকেট বের করে একা একাই বলল, 'এটা কী?'

রাসাদ আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'প্যাকেটটা খুলে দেখো।'

প্যাকেটটা খুলে তার ভেতর উঁকি দিয়ে পলাশ চিৎকার করে উঠল, 'এটার ভেতর তো সমুচা!' প্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে সেটা বের করে চকচক চোখে বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ভীষণ টেস্টি হবে এটা।'

'হ্যাঁ, সমুচাটা টেস্টি। তুমি খাওয়া শুরু করো। আমার কাছে যে ঊনত্রিশটা আছে, সেগুলো সবাইকে একটা করে দিয়ে দিচ্ছি আমি।' সবাইকে সমুচা দিয়ে স্যার ক্লাসে এসে যেখানে দাঁড়ান, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল রাসাদ। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কারো বিশ্বাসই হচ্ছে না — একটা সমুচা কীভাবে পলাশের ব্যাগে গেল!

রাসাদ হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'কী হলো, তোমরা সমুচা হাতে নিয়ে বসে আছো কেন, খাও।'

সমুচা খাচ্ছে সবাই। রাসাদ পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছে আবার পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'তোমরা নিশ্চয় ক্লাসে প্রতিদিন হোমওয়ার্ক করে আনতে পারো না।'

মুখে সমুচা নিয়েই একটা ছেলে বলল, 'হোমওয়ার্ক খুবই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। প্রতিদিন একই কাজ করতে কার ভালো লাগে!'

'একদম ঠিক কথা।' রাসাদ হাসতে হাসতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে হোমওয়ার্ক না করাটা দোষের কিছু না। তবে নিয়মিত না করাটা অবশ্যই দোষের এবং তাতে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়। যেদিন তোমাদের হোমওয়ার্ক করতে ইচ্ছে করবে না, সেদিন ক্লাসে এসে স্যারের সঙ্গে এ মজাটা করতে পারো। আমাদের অনেকের ধারণা স্যাররা কখনো মজা করতে পারেন না। স্যাররাও অনেক মজার মানুষ। তারা মাঝে মাঝে মজা করেনও, অন্যের মজা বোঝেনও।'

সামনের বেঞ্চের এক ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আগে যে স্কুলে ছিলাম সেই স্কুলের ইংরেজি স্যার অনেক মজার ছিলেন। আমাদের স্কুলের অঙ্ক স্যারও কিন্তু অনেক মজার।'

'তাই!' রাসাদ হাসতে হাসতে বলল, 'আমি তোমাদের এখন পাঁচটা বাক্য বলব। যেদিন তোমাদের হোমওয়ার্ক ইচ্ছে করবে না, সেদিন এই পাঁচটা বাক্যের যেকোনো একটা বলতে পারো।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'প্রথম বাক্য—স্যার, হোমওয়ার্ক তো আমি ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু হোমওয়ার্কের খাতাটা টেবিলে রেখে বাথরুমে গিয়েছিলাম আমি। বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখি, আমার ছোট বোন খাতা থেকে ওই হোমওয়ার্কের পাতাটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে পানিতে ভিজিয়ে ওর পুতুলকে খাওয়াচ্ছে।'

'চমৎকার!' পেছন থেকে একটা ছেলে বলল।

'দ্বিতীয় বাক্য—স্যার, স্কুলে আসার সময় অন্য স্কুলের একদল ছেলে বলছিল, আপনি নাকি একজন বাজে টিচার। কথাটা শুনেই আগুন লেগে গেল মাথায়। প্রতিবাদ করতেই শুরু হয়ে গেল মারামারি। তখন ব্যাগসহ হোমওয়ার্ক খাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছি।'

'এটা যে স্যারকে বলা হবে, সেই স্যার মহাখুশি হবেন।' পলাশ ওর শরীর কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে বলল।

রাসাদ টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, 'তৃতীয় বাক্য হচ্ছে—আমি আসলে ইচ্ছে করেই হোমওয়ার্ক করিনি। ভালো করে একটু ভেবে দেখুন স্যার, আমি না হয় হোমওয়ার্ক করে আনলাম, যারা করে আনবে না তারা কেমন হীনম্মন্যতায় ভুগবে না!'

'আগামীকাল হোমওয়ার্ক না করে আমি এই কথাটা বলব।' সাতিলের ডান পাশের ছেলে উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল।

'চতুর্থ বাক্য — স্যার, হোমওয়ার্কটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট চলে গেল। বাসায় তখন কোনো মোমবাতি ছিল না। মা আগুন ধরানোর জন্য কাগজ চাইতেই আমাদের কাজের মেয়েটা অন্ধকারে ভুলে আমার খাতার পাতাটা ছিঁড়ে দিয়েছিল মাকে।'

'এটা কিন্তু আমাদের বাসায় কয়েকবার হয়েছে।' ন্যাড়া মাথার একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের কাজের মেয়েটা এত বোকা! মা যদি বলে একটা কাগজ দে তো, ও আমাদের খাতা থেকে কাগজ তো ছেঁড়েই, সকালে দেওয়া দৈনিক পত্রিকাটাও ছিঁড়ে দেয় ও। অথচ তখনো আমরা পত্রিকাটা ছুঁয়েই দেখিনি!'

'আমাদের বাসায় এ রকম একটা বোকা কাজের ছেলে ছিল। মাথায় কখনো তেল দিত না ও। ওর ধারণা ছিল, মাথায় তেল দিলেই বাসার সব তেলাপোকা ঝাঁপিয়ে পড়বে মাথায়, সব চুল খেয়ে ফেলবে ওর।' রাসাদ ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এবার পাঁচ নম্বর বাক্যটা বলি — স্যার, আপনার এত কাজের চাপ। হোমওয়ার্ক করলে খাতাটা আপনাকেই দেখতে হতো। এতে আপনার ওপর চাপটা আরো বাড়ত। আমি আসলে আপনার ওপর চাপ বাড়াতে চাইনি বলেই হোমওয়ার্কটা করিনি।' রাসাদ হাসতে হাসতে বলল, 'কী কেমন লাগল?'

সবাই হাত তুলে বলল, 'অদ্ভুত।'

রাসাদ কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, 'আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই আমাদের বাবার কাছ থেকে বিভিন্ন উপহার পাই। জন্মদিনে পাই, ঈদে পাই, পরীক্ষার রেজাল্টের পর পাই। কিন্তু — ।' রাসাদ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা কি আমাদের বাবাকে কখনো কোনো গিফট দেই বা দিয়েছি?'

'আমরা কীভাবে গিফট দেব!' মাঝখান থেকে একটা ছেলে চেহারা কিছুটা উদ্বিগ্ন করে বলল, 'আমরা গিফট কেনার টাকা পাব কোথায়?'

'কিছু গিফট আছে যা কিনতে টাকা লাগে না। ধরো, তোমার বাবার একটা অসুখ আছে, প্রতিদিন হাঁটার জন্য তাকে বাইরে যেতে হয়। একদিন সকালে তার হাত চেপে ধরে বলো — বাবা, একদিন ডাক্তারের পরামর্শ না মানলে তেমন কিছু হবে না, আজ তুমি হাঁটতে যেও না। দেখবে, বাবার চেহারাটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।'

'খুব সত্যি কথা।' কোঁকড়ানো চুলের একটা ছেলে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আমার বাবার ডায়াবেটিস, প্রতিদিন হাঁটতে হয় তাকে। মা মাঝে মাঝে বলে, আজ হাঁটতে হবে না। বাবা সেদিন কী যে খুশি হন!'

'ডাক্তারের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন খাবার টেবিলে বাবার প্রিয় খাবারগুলো দিয়ে দেখো, বাবা কত আনন্দ পান। আমার বাবার চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া নিষেধ, কিন্তু আমার ছোট আপু মাকে না জানিয়ে বাবাকে চুপিচুপি মাংস খেতে দেয়, কী যে খুশি হন বাবা! মন ভরে যায় তখন।'

'আমার আব্বুরও একই সমস্যা। ডাক্তার তেল জাতীয় খাবার খেতে নিষেধ করেছে। বাবাকে মাঝে মাঝে বাইরের কোনো হোটেলে পুরি, পেঁয়াজু খেতে দেখি। বাবার চেহারা তখন অন্য রকম দেখায়।' চোখে-মুখে আনন্দ নিয়ে পেছনের বেঞ্চ থেকে একটা ছেলে বলল।

'টিভির রিমোট কিন্তু বেশিরভাগ সময় মা কিংবা আমাদের দখলে থাকে। মা'রা বিভিন্ন সিরিয়াল দেখেন, আমরা দেখি কার্টুন কিংবা খেলা। মাঝে মাঝে বাবার হাতে রিমোটটা ছেড়ে দিও। দেখবে, খুব আনন্দ নিয়ে খবর দেখছেন।' রাসাদ একটু থেমে বলল, 'কথাগুলো কেন বললাম, জানো? চার দিন পর কিন্তু বাবা দিবস। বাবা দিবসে বাবা নিশ্চয় এই গিফটগুলো পেয়ে খুশি হবেন ভীষণ।'

ক্লাস থেকে বের হয়ে আসছে রাসাদ। হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল পলাশ। খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আমার ব্যাগে সমুচা আসল কীভাবে?'

পলাশের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল রাসাদ, 'তুমি খুব খেতে পছন্দ করো। আজ বিকেলে স্কুলের মাঠে এসো, তোমাকে একটা বুদ্ধি দেব। দেখবে, ইচ্ছেমতো মজার মজার খাবার খেতে পারছ তখন।' রাসাদ চোখ-মুখে দুষ্টুমির হাসি এনে বলল, 'কিন্তু কোনো টাকা-পয়সা লাগবে না তোমার।'

খাবারের কথা শুনেই আলতো করে ঢোক গিলল পলাশ। সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল রাসাদ।

ল্যাপটপের সামনে বসে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল রাসাদ। শব্দ করে ঘরে ঢুকল সাতিল। ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, 'মামা, সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

রাসাদ আগের মতোই তাকিয়ে রইল ল্যাপটপের দিকে। কী একটা খুঁজছে ইন্টারনেটে। সেদিকে মনোযোগ দিয়েই হাত বাড়াল সে সাতিলের দিকে, 'আয়, আমার কাছে একটু বোস। একটা জিনিস খুঁজছি। পেলেই তোর সব কথা শুনছি আমি।'

সাতিল আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইল। রাসাদ একটু সোজা হয়ে বসল, 'কী হলো, কাছে আসতে বললাম না তোকে!'

'আমার কোনো কিছু ভালো লাগছে না মামা।' কান্না কান্না চেহারা করে ফেলল সাতিল, 'টেনশনে চারদিক অন্ধকার দেখছি।'

ঝট করে রাসাদ ঘুরে তাকাল সাতিলের দিকে। ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সাতিল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল রাসাদ। খুব মমতা নিয়ে ভাগিনার কাঁধে হাত রাখল সে। বিছানার কাছে এসে বসিয়ে নরম গলায় বলল, 'কী নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে! সর্বনাশটা কী, বল তো?'

'নতুন একটা অঙ্ক স্যার এসেছেন স্কুলে!'

'কখন?' খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল রাসাদ।

'স্কুল ছুটির পর সবাই নতুন স্যার নিয়ে বলাবলি করছিল। হেড স্যারের রুমে উঁকি দিয়ে দেখি, সত্যি, নতুন একটা স্যার বসে আছেন হেড স্যারের টেবিলের সামনের চেয়ারে।'

'এতে সমস্যা কী?'

'আমাদের স্কুলের যে সবচেয়ে প্রিয় স্যার, সেই অঙ্ক স্যারকে সম্ভবত স্কুল থেকে বিদায় করা হবে এখন।'

'তোদের এই অঙ্ক স্যার তোদের খুব ভালোবাসেন, না?'

'শুধু ভালোবাসেন না, আমরা যেটা নিয়ে খুব চিন্তিত, যেটার জন্য তোমাকে ডেকে এনেছি আমি এখানে, সেটার ব্যাপারে স্যারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে আমাদের প্রতি। স্কুল কর্তৃপক্ষ সে জন্যই তো স্যারের প্রতি খেপেছেন। এই অঙ্ক স্যারকে তাড়িয়ে নতুন আরেকটা অঙ্ক স্যার এনেছেন।' সাতিল হঠাৎ রাসাদের একটা হাত আঁকড়ে ধরল, 'মামা, দ্রুত একটা কিছু করো। না হলে আমরা এ স্যারটাকে হারাব, যার জন্য চিন্তা করছি সেটাও হারাব।'

ল্যাপটপটা বন্ধ করে রাসাদ উঠে দাঁড়াল বিছানা থেকে। ঘর থেকে বের হতে নিতেই ঘুরে দাঁড়াল সে আবার। সাতিলের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'আমাকে দু'দিন সময় দে, দেখ না কী করতে পারি আমি।' রাসাদ সাতিলের হাত টেনে ধরল, 'চল, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। তোদের স্কুলের সামনে পলাশ দাঁড়িয়ে আছে, আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। চল, তোদের স্কুলের দিকে যাই।'

'পলাশের সঙ্গে তোমার কী কাজ মামা!'

মুচকি হাসল রাসাদ, কিছু বলল না। সাতিলের হাত ধরে বের হয়ে এলো সে ঘর থেকে।

স্কুল থেকে দেড় কিলোমিটার ফাঁকে বড় একটা ফাস্টফুডের দোকান আছে, সেখানে এসে দাঁড়াল রাসাদ; সঙ্গে সাতিল আর পলাশ। তিনজনই একসঙ্গে খাবারের দোকানটাতে ঢুকল, কিন্তু সাতিল আর রাসাদ বসল এক টেবিলে, দু' টেবিল ফাঁকে কোনার একটা টেবিলে বসল পলাশ, একা। খাবারের দোকানটা বেশ বড়ই। কয়েকজন বসে খাচ্ছেন। পরিবেশ অনেকটা শান্ত। ডান পাশের টেবিলে বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোট একটা ছেলে এসেছে, শব্দ করে উঠছে সে হঠাৎ হঠাৎ।

দুটো চিকেন আর দুটো কোকের অর্ডার দিল রাসাদ। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল অর্ডার দিচ্ছে পলাশও। কিছুক্ষণ পর টেবিলে খাবার এলো। রাসাদ আবার আড়চোখে তাকাল পলাশের দিকে। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। দুটো চিকেন, বড় একটা বার্গার, একটা স্যান্ডউইচ, একটা হটডগ, বড় একটা ক্যানে কোক দিয়ে টেবিলটা সাজানো ওর। এরই মধ্যে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে পলাশ।

সাতিল চিকেনে একটা কামড় দিয়ে বলল, 'মামা, পলাশ তো হেঁটে বোধহয় আজ এই দোকান থেকে বের হতে পারবে না। ওকে ক্রেন দিয়ে টেনে বের করতে হবে।'

'তুই যা-ই বলিস, ওর খাওয়া দেখে আমার কিন্তু ভালোই লাগছে।'

'কিন্তু এত কিছু খেয়ে ও সুস্থ থাকবে কীভাবে!'

'সম্ভবত এটা ওর জন্য কোনো ব্যাপারই না।' চিকেনে কামড় দিয়ে রাসাদ বলল, 'দেখি না কী করে।'

বিশ-বাইশ মিনিটের মধ্যে টেবিল একেবার খালি করে ফেলল পলাশ। ছোট্ট করে একটা ঢেঁকুর ছাড়ল ও। এখান থেকেই রাসাদ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেল সেই ঢেঁকুরের শব্দ। সাতিল বড় বড় করে ফেলল চোখ, 'মামা, ওটা ঢেঁকুরের শব্দ শুনলাম, না পলাশের পেট ফাটার শব্দ শুনলাম!'

রাসাদ কোনো জবাব দিল না। ওর মনোযোগ এখন পলাশের দিকে। আর কী কী যেন আবার অর্ডার দিচ্ছে ও বয়কে ডেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে বয় ওর টেবিলে বড় একটা কাচের পাত্রে কয়েক কালারের আইসক্রিম রেখে গেল। কিছুটা হেলান দিয়ে বসে আইসক্রিমের পাত্রটা নিল পলাশ। আশপাশে না তাকিয়ে, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, আইসক্রিমগুলো শেষ করতে লাগল সে।

সাতিল আগের চেয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলল, 'মামা, আমি সিওর, এবার ওর পেট ফাটবেই।'

'পৃথিবীর কোথাও কোনো রেকর্ড নেই যে, বেশি খেয়ে কোনো মানুষের পেট ফেটেছে।' রাসাদ আশপাশটা ভালো করে তাকাল। পলাশের ঠিক পেছনে মাঝবয়সী একটা ভদ্রলোক বসে মুরগির একটা পা চিবাচ্ছেন। খুবই শান্ত স্বভাবের মনে হচ্ছে ভদ্রলোকটিকে। কোনো দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে তিনি কেবল নিজের কাজই করে যাচ্ছেন।

আইসক্রিম শেষ করে পলাশ আড়চোখে রাসাদের দিকে তাকাল। রাসাদ চোখ ইশারা করে পেছনের ভদ্রলোককে দেখাল। মিনিটখানেক পর পলাশ ওর জায়গা থেকে উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পেছনের দিকে তাকাল। মনোযোগ দিয়ে চিকেন খাচ্ছেন ভদ্রলোক। পলাশ একনাগাড়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

খেতে খেতে ভদ্রলোক মাথা উঁচু করে পলাশের দিকে তাকাল একপলক। তারপর আবার মাথা নিচু করে খেতে লাগলেন তিনি। একটু পর আবার তিনি তাকালেন পলাশের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা হাসি হাসি করে ফেলল পলাশ। কিছুটা বিব্রত হলেন ভদ্রলোকটি। হাতের চিকেনটা প্লেটে রেখে টিস্যু দিয়ে হাত মুছতে লাগলেন তিনি। পলাশ তখনো দাঁড়িয়েই আছে, হাসি হাসি মুখেই দাঁড়িয়ে আছে।

হাত মোছা শেষ করে ভদ্রলোক হাত দিয়ে ইশারায় কাছে ডাকলেন পলাশকে। শান্ত ছেলের মতো লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পলাশ। লোকটা তাকে বললেন, 'কিছু বলবে তুমি?'

পলাশ অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'জি।'

হাত দিয়ে ইশারা করলেন লোকটি। পলাশ তার সামনে চেয়ারে বসতেই তিনি বললেন, 'কী নাম তোমার?'

'প — ।' বলেই থেমে গেলে পলাশ। খুক করে কেশে বলল, 'পরশ।'

কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাসাদ। পলাশকে তো শিখিয়ে দেওয়া হয়নি নাম জিজ্ঞেস করলে আসল নাম না বলতে। যাক, ছেলেটা শুধু খায়-ই না, বুদ্ধিও আছে মাথায়।

লোকটি পলাশের দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন, 'পরশ, আমি আসলে আমেরিকা থাকি। নয় বছর পর দেশে এসেছি। অনেক কিছুই এখন বুঝতে পারি না এ দেশের।' লোকটি একটু থেমে বললেন, 'আমি খেয়াল করলাম, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছ তুমি আমার দিকে। মিটিমিটি হাসিও ছিল তোমার মুখে। কারণ কী বলো তো?'

'বলতে একটু লজ্জা লাগছে আমার। তবু বলি—আমার এক মামা ছিল, হুবহু আপনার মতো দেখতে।'

'ছিল মানে— ।' লোকটি একটু থেমে খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন নেই?'

মাথা নিচু করে ফেলল পলাশ, 'না নেই, মারা গেছেন তিনি।'

'ও, স্যরি।' লোকটি সত্যি সত্যি দুঃখিত হলেন।

'দু'বছর আগে ক্যানসারে মারা গেছেন মামা। কী যে ভালোবাসতেন মামা আমাকে! গল্প করতে করতে তাকে রেখে কোথাও গেলেই তিনি হাত উঁচু করে বলতেন, আবার দেখা হবে ভাগিনা।' পলাশ মাথা এদিক-ওদিক করে দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে বলল, 'মামার মতো করে কেউ কখনো বলেনি—আবার দেখা হবে ভাগিনা। কিন্তু এখনো আমার শুনতে ইচ্ছে করে কথাটা।'

ডান হাত বাড়িয়ে পলাশের কাঁধে হাত রাখলেন লোকটি, 'তোমার কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে।' লোকটি একটু থেমে বললেন, 'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'বাসায় যাব। স্যার কিছু হোমওয়ার্ক দিয়েছেন, শেষ করতে হবে সেগুলো।' পলাশ মাথা উঁচু করে বলল, 'সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর

আমি সাধারণত বাসার বাইরে থাকি না কখনো। আব্বু-আম্মু কেউ পছন্দ করেন না এটা।'

'ভালো তো।'

'জি।' উঠে দাঁড়াল পলাশ, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমি এখন আসি।'

লোকটার সামনে থেকে সরে এসে ক্যাশ কাউন্টারের দিকে আসছিল পলাশ। তার আগেই পেছন থেকে লোকটি বললেন, 'আবার দেখা হবে ভাগিনা।' পলাশ একটু চমকে উঠল, হেসেও ফেলল মনে মনে।

সাত-আট মিনিট পর লোকটা ক্যাশ কাউন্টারে এসে বিলের কথা বলতেই ম্যানেজার জানাল, 'স্যার, আপনার মোট বিল হয়েছে দুই হাজার তিন শ' ষাট টাকা।'

'কত?' কিছুটা শব্দ করে বললেন লোকটি।

ম্যানেজার আগের মতোই শান্ত স্বরে বললেন, 'দুই হাজার তিন শ' ষাট টাকা। শুধু খাবারের দাম না এটা, ভ্যাটও যোগ হয়েছে এখানে।'

'কিন্তু আমি তো এত কিছু খাইনি যে দু'হাজার টাকার ওপরে বিল হবে!' লোকটি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ইটস টু মাচ।'

'স্যার— ।' ম্যানেজার বিগলিত গলায় বললেন, 'এটা তো কেবল আপনার খাবারের বিল না। আপনার ভাগিনার বিলও নাকি আপনি দেবেন, আপনার ভাগিনা এখান থেকে যাওয়ার সময় তো তা-ই বলে গেল।'

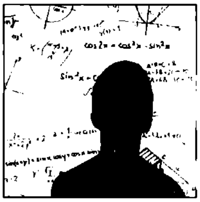

কিছুটা জোরেই রাসাদকে ধাক্কা দিল সাতিল, 'মামা, ওঠো তো। দেখো কারা এসেছে!'

চোখ দুটো সামান্য খুলে রাসাদ বলল, 'কারা এসেছে?'

'জহির ভাইয়ারা এসেছে।'

ঝট করে বিছানায় উঠে বসল রাসাদ, 'জহিররা এসেছে! কোথায়?'

'ড্রইংরুমে বসে আছে।'

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল রাসাদ, 'এখন তো মাত্র সাতটা বেজে দশ মিনিট। এত সকালে বাসায় এসেছে! বড় কোনো সমস্যা না তো!' দ্রুত বাথরুমের দিকে যেতে যেতে রাসাদ বলল, 'তুই গিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প কর। আমি হাত-মুখ ধুয়ে এখনই আসছি।'

রাসাদের হাত চেপে ধরল সাতিল, 'মামা, আমার কেমন ভয় ভয় করছে। বুক কাঁপছে আমার।'

সাতিলের চেহারার দিকে তাকিয়ে ভীষণ মায়া হলো রাসাদের। মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল সে, 'একটা কথা পড়িসনি—যত সমস্যা তত সমাধান।' রাসাদ সাতিলের পিঠে হাত দিয়ে দরজার দিকে ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'তুই ওদের সঙ্গে গল্প কর। আমি এখনই আসছি।'

দ্বিধা নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল সাতিল। রাসাদ দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে ড্রইংরুমে এসেই চমকে উঠল। সাত-আটজন ছেলে বসে আছে সোফায়। সবার চেহারায় চিন্তার ছায়া, উদ্বিগ্ন সবাই।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জহির রাসাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, 'স্যরি, এত সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তোমার। আসলে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে। আমি নিজেই সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছি, কিন্তু কোনো সমাধান বের করতে পারিনি।'

'তুমি এভাবে কথা বলছ, আমার খুব লজ্জা লাগছে জহির।' রাসাদ জহিরের পাশের সোফায় বসে বলল, 'তুমি তো এখন আমার বন্ধু, আমিও

নিজেকে তোমার বন্ধু মনে করি। একজন বন্ধু আরেক বন্ধুর কাছে এভাবে কথা বলে!' রাসাদ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'টমাস আর আরাফকে দেখছি। সম্ভবত তুমি বাদে এখানকার সবাই ক্লাস সেভেনে পড়ে। চেনা চেনা লাগছে সবাইকে।'

'হ্যাঁ, সবাই ক্লাস সেভেনে পড়ে। সমস্যাটা ওদের নিয়েই।' জহির একটু সোজা হয়ে বসল, 'তুমি বোধহয় শুনেছ আমাদের স্কুলে নতুন একটা অঙ্ক স্যার এসেছেন। তিনি নাকি স্কুলের সব ছাত্রের জ্ঞানের পরীক্ষা নেবেন। আজ প্রথমে নেবেন ক্লাস সেভেনের ছাত্রদের।'

'এতে সমস্যা কী?' রাসাদ জহিরের দিকে একটু ঘুরে বসল, 'এতে তো পাস-ফেলের কোনো ব্যাপার নেই।'

'তা নেই। সমস্যা এটাও না। সমস্যা হচ্ছে—এই নতুন স্যার আসার ফলে আমাদের আগের অঙ্ক স্যারকে বিদায় নিতে হবে।'

'এটা কী বলছ তুমি!' রাসাদ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

'আগের অঙ্ক স্যার হচ্ছেন আমাদের স্কুলের সবচেয়ে প্রিয় স্যার। ছাত্রদের তিনি বন্ধু মনে করেন।'

'আমি তোমাদের এই অঙ্ক স্যার সম্বন্ধে জানি। তিনি তোমাদের স্কুলের সব ছাত্রের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। ছাত্রদের সব ব্যাপারে তিনি সবার প্রথম এগিয়ে আসেন।'

'তুমি বোধহয় জানো না—আমাদের স্কুলের বড় একটা সমস্যা চলছে।' জহির চেহারা ম্লান করে বলল।

'তোমাদের স্কুলের সমস্যাটা আমি জানি।'

'তুমি জানো!' জহির কিছুটা লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'কীভাবে জানো তুমি? আমরা তো সেই সমস্যা নিয়ে চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি।'

'তার আগে আজ এত সকালে যে জন্য বাসায় এসেছ সেটা বলো।' রাসাদ মুখটা হাসি হাসি করে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা সবাই এভাবে শক্ত হয়ে বসে আছ। সমস্যা যেমন আছে তেমনি সমাধানও আছে। এতে এত চিন্তার কী আছে!'

জহির খপ করে রাসাদের একটা হাত ধরে বলল, 'নতুন এই অঙ্ক স্যারকে আমাদের স্কুলে চাকরি দিয়েছে স্কুল কমিটি। আমাদের হেড স্যারও এ ব্যাপারে তেমন কিছু জানেন না।' রাসাদের হাতটা আরো একটু চেপে ধরল জহির, 'তুমি একটু এই নতুন স্যারকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করো না, প্লিজ। আমরা অনেক খুশি হবো, সারা জীবন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।'

রাসাদ জহিরের হাতটা নিজের দু'হাতের মাঝে এনে চেহারাটা হাসি হাসি করে ফেলল। হাতটা সেভাবে ধরে রেখেই চোখ দুটো বুজে ফেলল সে। কয়েক সেকেন্ড পর শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'বুদ্ধি একটা এসেছে মাথায়, সম্ভবত কাজ হবে এতে। আজ ক্লাস সেভেনের ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেবেন না এই নতুন স্যার? তাই যা করার প্রথমে এই ক্লাস সেভেনের ছাত্রদেরই করতে হবে। পরে স্কুলের বাকি ছাত্ররা করবে।'

কথাটা শেষ করে রাসাদ সবার দিকে তাকাল। চোখের কোনায় পানি সবার। চকচক করছে ওদের চোখগুলো।

লাইব্রেরি রুমের পাশে ছোট্ট একটা রুম আছে, সেখানে বসে আছেন মহসীন মুন্সী স্যার, সাতিলদের স্কুলের নতুন অঙ্ক স্যার। একটু পর পিয়ন একটা একটা করে ছাত্র পাঠাবে; তিনি তাদের অঙ্ক না, প্রথমে সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করবেন। ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেনের ছাত্রদের পরীক্ষা হবে। আজ ক্লাস সেভেনের পালা। ক্লাস সেভেনে সাতাশজন ছাত্র। প্রথমেই পিয়ন বজলু মিয়া রোল নম্বর সাতাশ নিলয়কে পাঠাল স্যারের রুমে। স্যার এভাবেই পাঠাতে বলেছেন—সাতাশ, ছাব্বিশ, পঁচিশ, সব শেষে রোল নম্বর এক। রুমের বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করছে সবাই।

স্যারের রুমে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়াল নিলয়। স্যার কিছুটা রূঢ় স্বরে বললেন, 'রুমে ঢুকে যে স্যারকে সালাম দিতে হয়, এটা জানো না!'

'জানি স্যার।'

'তাহলে সালাম দিলে না কেন?'

'খাওয়ার সময় সালাম দিতে নেই। আপনি মুড়ি খাচ্ছেন স্যার।'

কিছুটা বিব্রত হলেন মহসীন মুন্সী স্যার। সকালে নাশতা করার সময় পাননি। ছাত্রদের জন্য সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন রেডি করতে করতে সময় চলে গেছে। রুমে বসে তাই শুকনো মুড়ি খাচ্ছেন, সঙ্গে কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ।

স্যার এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বসো।'

নিলয় এগিয়ে গিয়ে স্যারের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসতেই স্যার বললেন, 'তোমরা তো জানো আমি তোমাদের নতুন অঙ্কের শিক্ষক, কিন্তু আমি তোমাদের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেব আজ। আজ ক্লাস সেভেনের পালা। পরে অন্যান্য ক্লাস। তারপর মেধাবী ছাত্রদের বাছাই করে অন্য রকম একটা কাজ করব আমি সবাইকে নিয়ে।'

'জি স্যার।' নিলয় খুব ভদ্র ছেলের মতো বলল, 'কালকে ক্লাসে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন হেড স্যার এ ব্যাপারটা—আপনি আজ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেবেন।'

'প্রত্যেককে একটা করে প্রশ্ন করা হবে। উত্তর ভুল হোক কিংবা শুদ্ধ হোক, তাকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে না।' স্যার আরো এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে বললেন, 'বলো তো, বিদ্যুৎ আবিষ্কার না হলে কী হতো?'

নিলয় একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর খুব নরম গলায় বলল, 'মোমবাতি জ্বালিয়ে টিভি দেখতে হতো আমাদের।'

মহসীন স্যার নিলয়ের উত্তর শুনে বিষম খেলেন। তার মুখ থেকে অনেকগুলো মুড়ি ছিটকে এলো টেবিলে। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার। হাতের মুঠোতে মুড়ি ছিল স্যারের। সেগুলো মুখে না দিয়ে সামনের পাত্রে রেখে দিলেন আবার। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি এখন যাও।'

নিলয় রুম থেকে বের হতে নিতেই ঘুরে দাঁড়াল আবার। স্যারের দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার ডান কাঁধে যে বিড়ালের বাচ্চা বসে আছে, বাচ্চাটা খুব সুন্দর!'

ঝট করে স্যার তার ডান কাঁধে হাত রাখলেন। জায়গাটা শূন্য। বাম কাঁধেও হাত রাখলেন। শূন্য। স্যার কিছুটা রেগে গিয়ে বললেন, 'এই ছেলে, বিড়ালের বাচ্চা দেখলে কোথায় তুমি?'

'স্যার, আপনি না একটু আগে বললেন উত্তর ভুল হোক শুদ্ধ হোক একটাই প্রশ্ন করা হবে, দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে না।' স্যারের চোখ দুটো আরো বড় বড় করে দিয়ে নিলয় বের হয়ে এলো রুম থেকে।

রোল নম্বর ছাব্বিশ মৃদুল কান্তিকে রুমে পাঠাল পিয়ন বজুল মিয়া। মৃদুল রুমে ঢুকেই সোজা স্যারের টেবিলের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে স্যার বললেন, 'চেয়ারে যে বসেছ, অনুমতি নিয়েছ?'

'স্যার—।' মৃদুল চেয়ারটাতে ভালো করে বসে বলল, 'এখানে চেয়ারটা তো রাখা হয়েছে বসার জন্যই। কেউ কেউ আবার চেয়ারে দাঁড়িয়ে খেলতেও পছন্দ করে। কিন্তু চেয়ার তো দাঁড়ানোর জায়গা না। তাই কারো দাঁড়ানোর ইচ্ছে করলে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন, বসার জন্য অনুমতি নেওয়ার কোনো দরকার আছে কি? অনুমতি-টনুমতি চাওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট হয়। বড়রা বলেন না—সময় নষ্ট করা বড্ড খারাপ কাজ।'

মহসীন স্যার মুখভর্তি মুড়ি চাবাচ্ছিলেন। তিনি চাবানো বন্ধ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মৃদুলের দিকে। মৃদুল সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, প্রশ্ন করুন। বাইরে আরো পঁচিশজন দাঁড়িয়ে আছে।'

কিছুটা চমকে উঠলেন স্যার। মুখে মুড়ি নিয়েই তিনি বললেন, 'বলতে পারবে, মানুষ কোন কাজটা ঘুমের মধ্যেও করতে পারে?'

'বিছানায় শুয়ে থাকার কাজ।' ঝটপট উত্তর দিল মৃদুল।

চেহারা লাল হয়ে গেছে স্যারের, রেগে গেছেন তিনি। কিন্তু শান্ত গলায় মৃদুলকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।'

নিলয়ের মতো মৃদুলও রুম থেকে বের হতে নিতেই ঘুরে দাঁড়াল। স্যারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, একটা বিড়ালের বাচ্চা বসে আছে আপনার ডান কাঁধে, খুব কিউট লাগছে বাচ্চাটা!' বলেই আর কোনো দিকে না তাকিয়ে রুম থেকে বের হয়ে এলো মৃদুল।

মহসীন স্যার ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে। জানালায় যে কাচ লাগানো আছে, তার সামনে গেলেন। মাথা এদিক-ওদিক করে দেখার চেষ্টা করলেন নিজেকে। নিচু হয়ে দু'কাঁধের দিকে তাকালেন ভালো করে। না, কাঁধে কোনো বিড়ালের বাচ্চা নেই। কপাল কুঁচকিয়ে সোজা হলেন স্যার। কোনো কিছুই নেই কাঁধে, অথচ দু-দুটো ছেলে বলে গেল কাঁধে নাকি বিড়ালের বাচ্চা আছে!

চেয়ারে আবার বসলেন মহসীন স্যার। চব্বিশ নম্বর রোলের রাব্বি রুমে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে। ওর হাতে একটা চানাচুরের প্যাকেট, লাল রঙের প্যাকেট। চানাচুর খেতে খতে স্যারের সামনে দাঁড়াতেই স্যার বললেন, 'তুমি চানাচুর খাচ্ছ যে!'

'প্রশ্নটা তো আমারও—আপনি মুড়ি খাচ্ছেন যে!' চেয়ারে বসতে বসতে রাব্বি বলল, 'আসলে হয়েছে কি স্যার, শুনলাম আপনি শুধু মুড়ি খাচ্ছেন। শুধু মুড়ি কি আর খেতে ভালো লাগে! বলতে পারেন, চানাচুরটা তাই আপনার জন্য কিনে আনা।' স্যারের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে রাব্বি বলল, 'নিন স্যার, মুড়ির সঙ্গে মিশিয়ে খান, বহুত মজা পাবেন।'

স্যার প্যাকেটটা নিলেন না। হাতের মুঠির মুড়িগুলো মুখে না দিয়ে সামনের পাত্রে রেখে বললেন, 'কমলা আর আপেলের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কি—বলো তো?'

'খুবই সহজ প্রশ্ন স্যার—কমলার রং কমলা, কিন্তু আপেলের রং আপেল না।'

মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল স্যারের। পরপর তিনটা ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, তিনজনই উল্টাপাল্টা উত্তর দিল। কেন? কিছুই মাথায় আসছে না স্যারের। কথা বলতেও যেন ভুলে গেছেন তিনি হঠাৎ। হাত দিয়ে ইশারা

করে রাব্বিকে চলে যেতে বললেন। রাব্বি চলে যেতে নিতেই ঘুরে দাঁড়াল। স্যারের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার ডান কাঁধে যে বিড়ালের বাচ্চাটা বসে আছে, ওর লেজটা বেশ বড়! বাচ্চাটাও দেখতে বেশ চমৎকার!'

রুম থেকে বের হয়ে এলো রাব্বি। মাথাটা আগের চেয়ে ঘুরে উঠল স্যারের। তিনি তার দু'কাঁধই দু'হাত দিয়ে একসঙ্গে দেখতে লাগলেন। বিড়ালের বাচ্চা তো দূরের কথা, একটা মশাও নেই সেখানে।

রোল নম্বর তেইশ অনুপস্থিত, জ্বর এসেছে তার। বাইশ নম্বর রোল হচ্ছে তপুর। তপু বেশ তোতলা। স্যারের রুমে ঢুকতেই স্যার বললেন, 'রুমে ঢুকতে দেরি করলে কেন?'

'বদ...বদ...বদ...।' তোতলাতে শুরু করে তপু।

'কী! আমি বদ?' রেগে চিৎকার করে বলেন স্যার।

'না, আসলে আমার বদহজম হয়েছে তো। এতক্ষণ তাই বা... বা...বা...।' তপু তোতলাতে শুরু করে আবার।

'বাথরুমে ছিলে?'

'না, বাদামের খোসা খাচ্ছিলাম। বাদামের খোসা খেলে নাকি বদ... বদ... বদ...।'

'বদহজম।'

'জি, বদহজম সেরে যায়।'

স্যার ভালো করে কিছুক্ষণ দেখলেন তপুকে। তারপর মুড়ির পাত্রে হাত দিতে নিতেই থেমে গিয়ে বললেন, 'বলো তো, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো প্রাণী কোনটি?'

'জেব্রা স্যার। কারণ জেব্রা এখনো সাদা-কালোই আছে।'

রাব্বির কথা শুনে মাথা ঘুরে উঠেছিল স্যারের; তপুর কথা শুনে মাথা না, সমস্ত রুমটাই ঘুরতে লাগল তার চোখের সামনে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, রুমের সব কিছু তার চারপাশে ঘুরছে। ভনভন শব্দও হচ্ছে। আগের মতোই ইশারা করলেন স্যার তপুকে। তপু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল না চেয়ার থেকে। স্যারের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলল, 'স্যার, আমি অনেক মানুষ দেখেছি, যারা বিভিন্ন পশু-পাখিকে অনেক ভালোবাসেন। কিন্তু আপনার মতো কাউকে দেখিনি। আপনি একটা বিড়ালের বাচ্চাকে আপনার ডান কাঁধে বসিয়ে রেখেছেন। কী সুন্দর যে লাগছে বাচ্চাটাকে দেখতে!'

তপু উঠে দাঁড়াল স্যারের সামনে থেকে। চানাচুরের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে পেছন ফিরতেই আবার ঘুরে তাকাল স্যারের দিকে। এক মুঠো চানাচুর স্যারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার বিড়ালের বাচ্চাটা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সম্ভবত চানাচুর খেতে ইচ্ছে করছে ওর। দিন স্যার—।' তপু মুঠো ভর্তি চানাচুরের হাতটা স্যারের দিকে এগিয়ে দিল, 'বিড়ালের বাচ্চাকে চানাচুর দিন।'

রাগে মাথা ফেটে যেতে চাচ্ছে মহসীন স্যারের। তিনি হাত ঝটকা দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যেতে বললেন তপুকে। তপু মুঠো ভর্তি চানাচুরগুলো মুখে দিয়ে চাবাতে চাবাতে বের হয়ে এলো রুম থেকে।

চোখের প্রচণ্ড পাওয়ারওয়ালা চশমা পরা রাজনের রোল নম্বর হচ্ছে একুশ। স্যার ওকে দেখে বললেন, 'তুমি ঠিকমতো চোখে দেখো তো?'

'জি, স্যার। এই দরজার কাছে থেকেও ওই যে আপনার টেবিলে একটা পাত্র দেখতে পাচ্ছি, ওখানে বিড়ালের বাচ্চার জন্য যে সাদা দুধ রাখা আছে, সেটাও দেখতে পাচ্ছি।'

'সাদা দুধ পেলে কোথায়, এটা তো সাদা মুড়ি।'

স্যারের দিকে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলের দিকে তাকাল রাজন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'স্যরি স্যার। মুড়িই তো।'

'তোমার নাম তো রাজন। আচ্ছা রাজন, তুমি ঠিকভাবে বলো তো—একটা বাইসাইকেল আর একটা বাসের মধ্যে পার্থক্য কী?'

চোখ থেকে চশমাটা খুলে রাজন টেবিলে রাখল। তারপর বলল, 'বাইসাইকেল তার স্ট্যান্ডটি সঙ্গে রাখে, কিন্তু বাস তার স্ট্যান্ডকে পেছনে রেখে চলে যায়।'

স্যার এবার সত্যি সত্যি বোবা হয়ে গেলেন। হাত দিয়ে ইশারা করে রাজনকে রুম থেকে চলে যেতে বললেন স্যার। রাজন টেবিল থেকে চশমটা নিয়ে চোখে পুরতেই চমকে উঠল। স্যারের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, একি! আপনার ডান কাঁধে বিড়ালের বাচ্চা কেন? এত সুন্দর বিড়ালের বাচ্চা কোথায় পেলেন আপনি?'

দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলেন স্যার। অনেকক্ষণ সেভাবে থাকার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—না, মাঝের আর কোনো ছেলেকে না, থার্ড, সেকেন্ড এবং ফার্স্ট বয়কে ডেকেই আজকের পরীক্ষা শেষ করবেন এবং তিনজনকে একসঙ্গে ডাকবেন, একই প্রশ্ন করবেন। স্যার দেখবেন, তিনজন একই ধরনের উত্তর দেয়, না ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেয়।

পিয়ন বজলু মিয়াকে বলতেই, রোল নম্বর তিন মাথায় ঝাঁকড়া চুলের মিথুন, রোল নম্বর দুই অতিরিক্ত ফর্সা জুবায়ের এবং রোল নম্বর এক বোকা বোকা চেহারার সানতুরকে ভেতরে পাঠালেন তিনি। ভেতরে ঢুকেই ওরা তিনজন একসঙ্গে সালাম দিল স্যারকে। হাতের মুঠোতে মুড়ি নিয়ে মুখে দিতে যাচ্ছিলেন স্যার, ওদেরকে দেখে হাত ফিরিয়ে আনলেন। সামনের পাত্রতে মুড়িগুলো রেখে ইশারা করলেন। স্যারের টেবিলের সামনে চারটা চেয়ার, ওরা তিনজন তিনটেতে গিয়ে বসল। চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলেন স্যার, সোজা হলেন তিনি। তিনজনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর খুক করে কেশে বললেন, 'আমি তোমাদের তিনজনকে একটাই প্রশ্ন করব। তোমরা একে একে সেটার উত্তর দেবে।'

স্যার একটু থামলেন, আবার একটু খুক করে কেশে বললেন, 'বলো তো, আলো আর শব্দের মধ্যে কোনটির গতি সবচেয়ে বেশি?' স্যার মিথুনের দিকে তাকালেন, 'প্রথমে তুমি বলো মিথুন।'

'অবশ্যই আলোর।'

'একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে?'

'আমি যখন রেডিও অন করি, তখন প্রথমে আলো জ্বলে, তারপর শব্দ কানে আসে।' চেহারা হাসি হাসি করে মিথুন বলল।

রাগতে গিয়েই থেমে গেলেন স্যার। কিছুটা আড়চোখে জুবায়েরের দিকে তাকালেন। স্যার জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, 'মিথুনের সঙ্গে আমি একমত। অবশ্যই আলোর গতি বেশি। এটা আমি জানলাম কী করে—আমি যখন টিভি অন করি, তখন আগে আলো দেখতে পাই, পরে শব্দ শুনতে পাই।'

চোখ বড় বড় করে ফেললেন স্যার। তিনি বুঝতে পারলেন না—কঠিন কোনো প্রশ্ন করেছেন কি না, না ছাত্ররাই বোকা! মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করবেন তিনি।

সানতুরের দিকে তাকালেন স্যার, 'সানতুর, মনে করো, একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছ তুমি। সামনের আরেকটা পাহাড় একটা কামান রাখা আছে। সেই কামান থেকে একটা গোলা ছোড়া হলো। তুমি প্রথমে কামানের মাথায় আগুন দেখবে, না কামানের গোলার শব্দ শুনবে?'

সানতুর মেরুদন্ড সোজা করে বসে বলল, 'অবশ্যই কামানের মাথায় আগুন দেখব।'

স্যার খুশি হলেন সানতুরের উত্তর শুনে, 'একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে?

'অবশ্যই স্যার।' সানতুর খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আমার চোখ দুটো আমার কান দুটোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সামনে বলে আমি আগে আলো দেখতে পাব, পরে শুনতে পাব।'

সত্যি সত্যি এবার রেগে গেলেন স্যার। তিনজনকে একসঙ্গে ধমক দিতে নিয়েই শান্ত হয়ে গেলেন। বিড়বিড় করতে লাগলেন, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বললেন না। আগের মতোই হাত দিয়ে ইশারা করলেন ওদের। রুম থেকে বের হয়ে আসছিল ওরা। জুবায়ের হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। স্যারের দিকে ভালো করে তাকিয়ে মিথুনকে বলল, 'স্যারের কাঁধে ওটা কী, বল তো?'

মিথুন অতি-উৎসাহ নিয়ে স্যারের কাঁধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে, ওটা তো বিড়ালের বাচ্চা।'

সানতুর পেছন থেকে সামনে এলো, 'সত্যি তো একটা বিড়ালের বাচ্চা বসে আছে স্যারের কাঁধে। দেখেছিস, বাচ্চাটা কি নাদুসনুদুস!'

'দেখতেও কী সুন্দর!' জুবায়ের স্যারের দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'স্যার, এত ছোট বিড়ালের বাচ্চা পেলেন কোথায় আপনি? বাচ্চাটা কী সুন্দর করে বসে আছে আপনার কাঁধে! স্যার, ও একা একা দুধ খেতে পারে তো?'

'ও কি গরুর দুধ খায়, না গুঁড়ো দুধ গুলিয়ে খাওয়ানো হয় ওকে?' মিথুন জিজ্ঞেস করল।

'একা একা দুধ খেতে পারে ও, না ফিডারে করে খায়?' স্যারের দিকে আরো একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জুবায়ের বলল।

'তোরা যাই বলিস—।' সানতুর হাসতে হাসতে বলল, 'স্যারের শখ আছে বলা যায়। কী সুন্দর একটা বিড়ালের বাচ্চাকে বসিয়ে রেখেছেন কাঁধে!'

রুম থেকে বের হয়ে এলো তিনজনই। স্যার ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন। পাশের বাথরুমে ঢুকলেন দ্রুত। সেখানে একটা আয়না আছে। আয়নার দিকে তাকালেন ভালো করে। এদিক-ওদিক দেখলেন সময় নিয়ে। কোনো বিড়ালের বাচ্চা তো দূরের কথা, ছোট একটা পিঁপড়াও দেখতে পেলেন না সেখানে। আরো কিছুক্ষণ আয়নার সামনে কাটিয়ে যেই না রুম থেকে বের হয়ে স্কুলের বারান্দায় এলেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস এইটের জহির স্যারকে দেখে বলল, 'স্যার, আপনার কাঁধের বিড়ালের বাচ্চাটা তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওটা পড়ে যাবে তো! হাত দিয়ে চেপে ধরে কোলের কাছে আনুন।'

জহির পাশ কেটে চলে যেতেই স্যার আনমনে কাঁধে হাত রাখলেন আবার। না, ওখানে কিচ্ছু নেই, একেবারেই নেই। একা একা মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন তিনি এবং সেভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হেড স্যারের রুমের দিকে যাচ্ছিলেন। সাদমান পাশ দিয়ে যেতে নিতেই থমকে দাঁড়াল। স্যারের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার কাঁধে যে বিড়ালের বাচ্চাটা রেখেছেন, ওটা তো মুখ হাঁ করে আছে। সম্ভবত খিদে পেয়েছে ওর। আহা রে, ছোট্ট বেচারা! খিদেয় কেমন নেতিয়ে পড়েছে।'

স্যার থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চিন্তিত চেহারা নিয়ে হেড স্যারের রুমে ঢুকেই বললেন, 'স্যার, দেখুন তো, আমার কাঁধে কোনো বিড়ালের বাচ্চা বসে আছে কি না?'

চোখ বড় বড় করে অঙ্ক স্যারের দিকে তাকালেন হেড স্যার। চেহারাটা আস্তে আস্তে রাগে ভরে যাচ্ছে তার। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থাকার পর তিনি বললেন, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার। যান, স্কুলের মাঠের কোনায় যে টিউবওয়েলটা আছে, ওটার পানি খুব ঠাণ্ডা। মাথায় কমপক্ষে আধা ঘণ্টা ওই ঠাণ্ডা পানি ঢালুন।'

মহসীন মুন্সী স্যার হেড স্যারের রুম থেকে বের হয়ে টিউবওয়েলটার দিকে চলে গেলেন সোজা। তারপর টিউবওয়েল টিপে মাথায় পানি দিতে লাগলেন খুব যত্ন করে। পুরো আধা ঘণ্টা মাথায় পানি দেওয়ার পর তিনি খেয়াল করলেন, সারা স্কুলের সব ছাত্র ক্লাস ছেড়ে বারান্দায় চলে এসেছে। তারা অধীর আগ্রহে প্রচণ্ড আনন্দ নিয়ে মাথায় পানি দেওয়া দেখছে তার। টিচার্স রুম থেকে সব স্যারও বের হয়ে আসেন বারান্দায়। সবাই হাসছেন। কেবল হেড স্যার মুখটা গম্ভীর করে রেখেছেন।

ক্লাস টেনের থার্ড বয় রাজন টিউবওয়েলের দিকে এগিয়ে গিয়ে মহসীন স্যারের পাশে দাঁড়াল। তারপর চোখ দুটো বড় বড় করে স্যারকে বলল, 'স্যার, আপনি মাথায় পানি দিচ্ছেন, কিন্তু আপনার কাঁধের বিড়ালের বাচ্চাটা তো ভিজে গেছে। ওইটুকুন বাচ্চা, মারা যাবে তো। কী সর্বনাশ!'

মহসীন স্যার ভেজা মাথায় হেড স্যারের সামনে চলে এলেন। কাতর মুখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, সত্যি করে বলুন তো—আমার কাঁধের বিড়ালের বাচ্চাটি কি ভিজে গেছে?' সঙ্গে সঙ্গে হেড স্যার ধমক দিয়ে বললেন, 'যান, আপনি আরো আধা ঘণ্টা পানি ঢালুন মাথায়।'

মাঝরাতের দিকে হেড স্যারের বাসায় নাকি ছুটে গিয়েছিলেন নতুন অঙ্ক স্যার। দরজা ধাক্কিয়ে স্যারকে ডেকে তুলে চিৎকার করে বললেন, 'স্যার,

আমি ঘুমাতে পারছি না। ঘুমাতে গেলেই কাঁধের বিড়ালের বাচ্চাটা খামচাচ্ছে আমাকে। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে স্যার। কী যে করি! আমি আর এখানে থাকব না। চাকরি ছেড়ে দেব আমি। চলে যাব এখান থেকে।'

মহসীন স্যার আর স্কুলে আসেননি। সারা স্কুল রটে গিয়েছে—পাগল হয়ে গেছেন নাকি তিনি।

স্কুল ছুটির পর কোনার দেয়ালের ওপর বসে আছে নিলয়, জহির, সাদমান, সাদাত, ইফতি, টমাস, সানতুর। একটু ফাঁকে রাসাদও বসে আছে। বেশ শব্দ করে পা নাচাচ্ছে ও, কী যেন ভাবছে পা দোলাতে দোলাতে। কিন্তু সবার চেহারা হাসি হাসি। সাদমান একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমরা প্রথমে আন্তরিকভাবে রাসাদকে একটা ধন্যবাদ দিতে পারি। ওর বুদ্ধিতেই ওই নতুন অঙ্ক স্যারকে তাড়ানো গেছে।'

'ধন্যবাদ দেওয়ার আগে চল, ওকে আমরা দাঁড়িয়ে এক মিনিট ধরে একটা সালাম দেই।' দেয়ালের ওপর থেকে ধপাস করে নেমে, কপালে হাত রেখে জহির বলল, 'ঠিক এভাবে, ওই যে গার্ড অব অনার দেয়ার মতো।'

'খুবই ভালো প্রস্তাব।' রাব্বি সমর্থন করল।

'নতুন অঙ্ক স্যারও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন—তার কাঁধে সত্যি সত্যি একটা বিড়ালের বাচ্চা আছে।' জহিরের পিঠে একটা হাত রেখে সাদমান বলল, 'চমৎকার একটা আইডিয়া দিয়েছিল রাসাদ। আমরা সফল, এক শ' পার্সেন্ট সফল। কিন্তু কোনো স্যারই জানলেন না, নতুন স্যারকে আমরা তাড়ালাম, আমাদের বুদ্ধিতে হয়েছে কাজটা।'

চমকে উঠল সবাই হঠাৎ। সামনের রাস্তা দিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছেন শোয়াইব স্যার, ওদের আগের অঙ্ক স্যার। ওদেরকে দেখেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। দেয়াল থেকে সবাই নেমে পড়ল একসঙ্গে। স্যার সবার দিকে একপলক তাকিয়ে চেহারা ম্লান করে বললেন, 'কাজটা তোমরা না করলেই পারতে। আমি না হয় এ স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে যেতাম, কোনো সমস্যা হতো না আমার।'

'কিন্তু আমাদের হতো।' জহির স্যারের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমরা আপনার মতো একজন স্যার কোথায় পেতাম! যিনি সন্তানের মতো তার প্রতিটি ছাত্রকে অঙ্ক শেখান।'

শোয়াইব স্যার কোনো জবাব দিলেন না। ঘুরে দাঁড়ালেন স্কুলের দিকে। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার মতো মূল্যবান আর কিছু নেই। চোখ দুটো শিরশির করছে তার। চোখের জল লুকোতে হাত রাখলেন তিনি দু' চোখে। পেছন থেকে সাদমান ডাক দিল, 'স্যার।'

স্যার দাঁড়ালেন, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালেন না। সাদমান এগিয়ে গিয়ে স্যারের একটা হাত ধরে নিজের মাথায় রেখে বলল, 'স্যার, আপনি যখন মাঝেমাঝেই এভাবে হাত রাখেন আমাদের মাথায়, কী যে আনন্দ লাগে তখন আমাদের! নিজের বাবার মতো মনে হয় তখন আপনাকে।'

স্যার আলতো করে ঘুরে দাঁড়ালেন। এক হাত দিয়ে সাদমানকে জড়িয়ে ধরে আরেক হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। জহিরসহ সবাই এগিয়ে এলো স্যারের দিকে। স্যার ওদেরকেও জড়িয়ে ধরলেন।

দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে রাসাদ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সবার দিকে। এবার শেষ কাজটা করতে হবে তাকে, যে কাজটা করার জন্য এখানে এসেছে সে।

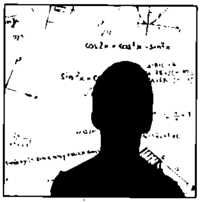

স্কুল মাঠের কোনায় যে উঁচু জায়গাটা আছে, সেখানে বসে আছে রাসাদ। উদ্বিগ্ন হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জহির। পাশে সাদমান, টমাস, পলাশ আরাফও বসে আছে। বড় বড় হয়ে আছ সবার চোখ। কারণ, সবাইকে কী একটা নাকি জরুরি কাজের কথা বলবে আজ রাসাদ। কাজটা খুবই জরুরি এবং আজ-কালের মধ্যে কাজটা করে ফেলতে হবে সবার।

দোকান থেকে বড় এক বোতল কোক আর দুটো বিস্কুটের প্যাকেট কিনে এনে রাসাদের হাতে দিল সাতিল। তারপর ডান পাশে পলাশের কাছে গিয়ে বসল ও। কোকের বোতলটা হাতে নিয়ে রাসাদ বলল, 'আগে কোক খাব আমরা, না জরুরি কথাটা শেষ করব?'

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলল, 'কোক-টোক পরে খাওয়া যাবে, আগে জরুরি কথটা বলো।' জহির সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলল, 'তোমার কথা না শোনা পর্যন্ত আমি ভালো করে নিঃশ্বাসই নিতে পারছি না। প্লিজ, তাড়াতাড়ি বলো।'

দু'হাতের তালু একসঙ্গে করে ঠোঁটে ঠেকাল রাসাদ। কয়েক সেকেন্ড সেভাবে থেকে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'একটা সত্যি কথা বলবে তোমরা?' রাসাদ চোখ দুটো নিচু করে ফেলল, 'এ কয়দিনে আমি কি তোমাদের বন্ধু হতে পেরেছি?'

ঝট করে মেরুদণ্ড সোজা করে বসল জহির, 'এটা কী বললে তুমি! তুমি বন্ধু হতে পেরেছ কি না সেটা বড় কথা না, আমরা তোমার বন্ধু হতে পেরেছি কি না বড় কথা সেটা।'

'কম্পিউটার আমার খুব প্রিয়, সেই কম্পিউটারের মাধ্যমে অনেক বন্ধু হয়েছে আমার, বিদেশিও অনেক বন্ধু আছে আমার। ওদেরকে প্রায়ই মেইল করি আমি, ওরাও করে।' আরাফ একটু থেমে বলল, 'কিন্তু তোমার মতো একটা বন্ধু পেয়ে আমি সত্যি খুব গর্বিত।'

'বন্ধু কিংবা বন্ধুত্ব আসলে অন্য রকম একটা জিনিস। সবাই আসলে বন্ধু, কিন্তু আসল বন্ধু খুব কম।' রাসাদের হাত এগিয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেক করতে করতে সাদমান বলল, 'তুমি হচ্ছ আসল বন্ধু।'

'আমার আব্বু বলে, প্রতিটা ভালো মানুষই হচ্ছে একজন ভালো বন্ধু।' পলাশ বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'তোমার মতো ভালো মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আনন্দের শেষ নেই আমার।'

টমাস একটু নড়েচড়ে বসল, 'যারা ভালো ক্রিকেট খেলে তাদের বন্ধুর অভাব হয় না। সাদমান ভাইয়ার মতো আমারও ওই একই কথা—আসল বন্ধু আসলে কে? এই অল্প কয়দিনেই আমি বুঝে গেছি, তুমি হচ্ছ একজন জিনিয়াস বন্ধু, এ রকম জিনিয়াস বন্ধু হাজারে একটাও মেলে না।'

রাসাদের চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে। ম্লান হেসে ও বলল, 'তোমরা এভাবে বলছ, আমার খবু লজ্জা লাগছে।'

সাতিল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। তারপর রাসাদকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'রাসাদ মামা হচ্ছে তোমাদের বন্ধু, আমার কিন্তু মামাই। আমার সবগুলো মামার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মামা।'

রাসাদ সাতিলের হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, 'তোমাদের এই স্কুল যারা পরিচালনা করেন তারা হচ্ছেন মোট পাঁচজন। পাঁচজন নিয়ে পরিচালনা কমিটিই মূলত স্কুল পরিচালনা করেন। তা তো তোমরা জানো?'

মাথা উঁচু-নিচু করল সবাই।

'এই পাঁচজনের মধ্যে চারজন হচ্ছেন সাদমানের বাবা, আরাফের বাবা, জহিরের বাবা আর টমাসের বাবা। আর একজন হচ্ছেন আমাদের ছোট্ট বন্ধু পলাশের দাদু।' রাসাদ সবার দিকে হাসি হাসি চেহারা করে তাকাল, 'কী ঠিক বলেছি আমি?'

পলাশ রাসাদের সামনে থেকে কোকের বোতলটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'একদম ঠিক বলেছ তুমি। একটা কথা বলি তোমাদের—আমার দাদু হচ্ছেন আমার খুব ভালো বন্ধু। দাদুকে আমি যা বলি দাদু সেটাই শোনে।' পলাশ ফিসফিস করার মতো করে বলল, 'দাদু কিন্তু আমাকে ভীষণ ভয়ও পায়।'

'আমাদের সবার বাবাও আমাদের খুব ভালোবাসেন, আমাদের বন্ধুর মতো তারা।' জহির খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল।

সাদমান একটা হাত উঁচু করে বলল, 'আমি আমার বাবার কাছে এ পর্যন্ত যা চেয়েছি, বাবা সেটাই দিয়েছেন। অনেকেই বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। বাবাকে আমি বলেছি—বড় হয়ে আমি ম্যাজিশিয়ান হবো। বাবা হেসে হেসে বলেছেন, ওকে, নো প্রবলেম। তবে তোমাকে জুয়েল আইচের মতো বড় ম্যাজিশিয়ান হতে হবে।'

'আমার বাবা অবশ্য একটু রাগী। তবে আমার সঙ্গে কখনো রাগেন না।' টমাস হাসতে হাসতে বলল, 'মাঝে মাঝে লেখাপড়ায় আমি কিন্তু একটু-আধটু ফাঁকি দেই, সেটা ওই ক্রিকেট খেলার জন্য। বাবা কিছুই বলেন না। এটা আমার এত ভালো লাগে!'

মুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছিল আরাফ। রাসাদ সেটা লক্ষ করে বলল, 'আরাফ, তুমি কিছু বলবে না?'

'আমার কিন্তু কোনো ভাই-বোন নেই, আমি একা। আমার সব খেলা, সব গল্প কিন্তু ওই আব্বু-আম্মুর সঙ্গেই।' আরাফ চেহারাটা উজ্জ্বল করে বলল, 'আব্বুকে আমি কিন্তু মাঝে মাঝে বন্ধু বলেই ডাকি।

'খুব ভালো।' রাসাদ আবার সবার দিকে তাকাল, 'আমি এখন তোমাদের সেই জরুরি কথাটা বলব। তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনবে, তারপর তোমাদের মতামত জানাবে।' রাসাদ একটু থেমে কিছুটা করুণ গলায় বলল, 'আমার বিশ্বাস, তোমরা আমার এই কথাটা খুব আন্তরিকভাবে নেবে।'

স্কুলের পাশে যে ফাঁকা মাঠটা আছে, যেখানে বিকেলে স্কুলের ছাত্ররা বিভিন্ন খেলাধুলা করে, সেখানে বসে আছে জহির, সাদমান, আরাফ, পলাশ আর টমাস। ঘাসের ওপর দু'পা গুটিয়ে বসেছে ওরা, কিন্তু ওদের এক হাতে একটা ছোট বাঁশ, বাঁশের মাথায় কাগজের সাইন বোর্ড লাগানো।

স্কুল শুরু হওয়ার আগেই ওরা পাঁচজন বসেছে ওখানে। একটু পর সারা স্কুলের সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়তে লাগল মাঠে। একসময় স্কুলে আর কেউ রইল না। সবাই এসে বসেছে মাঠে, জহিরদের চারপাশে।

স্কুলের সব স্যার বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন তাকিয়ে আছেন মাঠের দিকে, কেবল হেড স্যারকে কেমন যেন শান্ত মনে হচ্ছে।

বেশ ফাঁকে একটা উঁচু জায়গায় চুপচাপ বসে আছে রাসাদ। একটু পর ও খেয়াল করল—আশপাশের অনেক মানুষ এসেও জড়ো হয়েছে মাঠের সামনে। সবাই বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে এখানে।

দশ-বারো মিনিট পর বড় একটা সাদা গাড়ি এসে থামল মাঠের সামনে। কোর্ট-টাই পরা এক লোক সেখান থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল সাদমান। হাত উঁচু করে বলল, 'আব্বু, আর একটু এগিয়ে আসবে না তুমি এদিকে। আমাদের সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমরা কী চাই।'

সাদমানের কথা শেষ হতে না হতেই আরো চারটা গাড়ি এসে থামল মাঠের সামনে। জহিরের আব্বু, আরাফের আব্বু, টমাসের আব্বু আর পলাশের দাদু নেমে এলেন গাড়ি থেকে। এদের সবার চেয়ে পলাশের দাদুর বয়স বেশি। সবার সামনে এগিয়ে তিনি। পলাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পলাশ, এসব কী হচ্ছে?'

সাইন বোর্ডটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল পলাশ। দাদুর দিকে সাইন বোর্ডটা মেলে ধরে সে বলল, 'দাদু, তুমি তো আমার বন্ধু। তুমি কি চাও না তোমার এই বন্ধু ভালো থাকুক?'

পলাশের দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, 'অবশ্যই চাই।'

'যদি সেটাই চাও তাহলে আমাদের এই স্কুলের মাঠ দখল করে তোমরা মার্কেট বানাতে চাচ্ছ কেন? কেন তোমরা আমাদের এই একমাত্র খেলার মাঠ থেকে বিতাড়িত করতে চাচ্ছ? আমরা যদি না খেলি, আমাদের শরীর ভালো থাকবে কীভাবে, না খেললে বুদ্ধি বাড়বে আমাদের কীভাবে, আমরা আমাদের প্রিয় খেলা গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাটমিন্টন কোথায় খেলব? আমাদের সব এলাকা এখন ইট-পাথরে ভরাট হয়ে গেছে, সব জায়গায় এখন উঁচু উঁচু দালান, ফাঁকা জায়গা কোথায় দাদু? কোথায় একটা খেলার মাঠ? কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা বুক ভরে সজীব নিঃশ্বাস নেব? বলো দাদু, বলো?'

জহির পলাশের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আব্বু, তোমরা কেন এই খালি জায়গাটায় মার্কেট বানাতে চাচ্ছ? এখন তো অনেক মার্কেট, কিন্তু অনেক মাঠ তো আমাদের নেই। মাঠ না থাকলে আমরা খেলব কোথায়?'

হাতের সাইন বোর্ডটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আরাফ বলল, 'আব্বু, তোমরা যদি এখানে মার্কেট বানানোর চেষ্টা করো, আমাদের খেলাধুলার

পরিবেশ নষ্ট করো, তাহলে আমি ওই পুরানো বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠে লাফ দেব নিচে।'

টমাস ওর হাতের সাইন বোর্ডটা উঁচু করে ধরে বলল, 'আমিও লাফ দেব। আমাদের মাঠই যদি না থাকল, আমরা যদি খেলতেই না পারলাম, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী আমাদের! আমি ডাক্তার হতে চাই না, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই না, আমি এই মাঠে ক্রিকেট খেলে বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চাই।'

সারা স্কুলের সব ছাত্র উঠে দাঁড়াল। হাত উঁচু করে চিৎকার করতে লাগল ওরা—মাঠ দখল করা চলবে না চলবে না, খেলার পরিবেশ নষ্ট করা চলবে চলবে না চলবে না...।

পলাশ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'দাদু, তোমরা যদি তোমাদের সিদ্ধান্ত বদল না করো, আমরা সবাই পালিয়ে যাব, কেউ আর কোনো দিন বাসায় ফিরব না। কেউ আর কোনো দিন এই এলাকায় আসব না।' পলাশ কান্না শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের সবাই কান্না শুরু করে দিল। আরাফ হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল পুরোনো বিল্ডিংটার দিকে। তাই দেখে সাদমানও, তারপর জহির, পলাশ, টমাসও।

আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে সবার। পলাশের দাদু, আরাফের আব্বু, সাদমানের আব্বু, টমাসের আব্বু, জহিরের আব্বুও দৌড়াতে লাগলেন ওদের পেছনে। ভিড় ঠেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে তাদের। কিন্তু ওরা ছাদের ওঠার আগেই জড়িয়ে ধরলেন ওদের অনেকে। পলাশের দাদু পলাশকে জড়িয়ে বললেন, 'এটা কী করছিস, দাদু!'

পলাশ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'দাদু, তোমরা যদি মাঠ দখল করার সিদ্ধান্ত বদল না করো, তাহলে আমরা ছাদ থেকে লাফ দেব। কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না।' পলাশ ওর দাদুর হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল। দাদু আবার খপ করে হাত ধরে ফেললেন পলাশের। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি, ওই মাঠে কোনো মার্কেট বানানো হবে না। আমি পরিচালনা কমিটির সবাইকে বুঝিয়ে বলব, ওখানে মাঠ বানানো ঠিক হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে সাদমান, জহির, টমাস আর আরাফের আব্বু বললেন, 'আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলাম। স্কুলের মাঠ স্কুলের মাঠ হিসেবেই থাকবে। কোনো দালান-টালান গড়ে তোলা হবে না এখানে।'

সারা স্কুলের সব ছাত্র চিৎকার করে উঠল একসঙ্গে। রাসাদ হঠাৎ খেয়াল করল, সাতিল দৌড়িয়ে আসছে তার দিকে। কাছে এসেই ওকে জড়িয়ে ধরে সাতিল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ইউ আর গ্রেট মামা। আনন্দে আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, নাচতে ইচ্ছে করছে।'

বিকেলে সাতিলদের বাসায় সবাই এসে হাজির। রাসাদের হাতে ব্যাগ দেখে জহির বলল, 'কোথায় যাচ্ছা তুমি!'

'চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'বা রে, আমার স্কুল আছে না! সামার ভ্যাকেশন শেষ হয়ে এলো। স্কুল খোলার কয়দিন পরেই তো পরীক্ষা।' রাসাদ ওদের সোফা দেখিয়ে দিল, 'বসো।' ব্যাগটা রেখে ওদের পাশে বসে বলল, 'ভালোই হলো, দেখা হয়ে গেল তোমাদের সঙ্গে।'

'আমার কবে আসবে আমাদের এখানে?' সাদমান একটা হাত চেপে ধরল রাসাদের।

রাসাদ সাদমানের হাতটা নিজের দু'হাতের মাঝে এনে বলল, 'জেএসসি শেষ করেই চলে আসব। এত বন্ধু তৈরি হয়েছে এখানে আমার। ব্যাপারটা মনে হলেই খুব ভালো লাগে আমার।'

জহির রাসাদের দিকে একটু ঘরে বসে বলল, 'তুমি আমাদের কত বড় যে একটা উপকার করেছ আমরা কোনো দিন তা ভুলতে পারব না। আমাদের এলাকার একমাত্র মাঠ। আমরা সব সময় খেলতে পারব সেখানে, ভাবতেই আনন্দে ভরে ওঠে মন।'

'চার মাস পরই তো পরীক্ষা। তারপর এখানে চলে আসব আমি। একদিন সারা রাত আমরা ওই স্কুলের মাঠে হৈ-হুল্লোড় করব।' রাসাদ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাদমান সেদিন নতুন নতুন ম্যাজিক দেখাবে; কীভাবে ভালো ক্রিকেট খেলা যায়, টমাস তা শেখাবে; কোনো জায়গায় রহস্যময় কিছু ঘটলে সেই রহস্যকে কীভাবে ভাঙা যায় জহির তা আমাদের বোঝাবে, কম্পিউটারের গেমসগুলো কত সহজে খেলা যায় তা আরাফ শিখিয়ে দেবে আমাদের। আর পলাশ—।' রাসাদ পলাশের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'আমরা অনেকেই খেতে পছন্দ করি না। আমাদের আম্মুরা কত কৌশল করে আমাদের খাওয়ান। কীভাবে বেশি বেশি খাবার খাওয়া যায় সেটা শেখাবে আমাদের পলাশ।'

'খুব ভালো লাগছে আমার।' দু'হাত উঁচু করে, দু'দিকে মেলে দিয়ে আরাফ চিৎকার করে বলল, 'আমরা সেদিন চিৎকার করে গান গাইব। আমাদের চিৎকারে আশপাশের সবার ঘুম ভেঙে যাবে। তারা সবাই তখন মাঠে এসে দেখবে কিছু পাগল ছেলের পাগলামি।'

'সেদিন হবে আমাদের স্বাধীনতার দিন, যা ইচ্ছে তাই করার দিন।' রাসাদ দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে সবাইকে জড়িয়ে ধরার মতো করে বলল, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবুও বলতে হচ্ছে—গুড বাই।'

হেড স্যারের বাসার কাছে এসে সাতিল রাসাদকে বলল, 'স্যার বাসার ভেতরেই আছে। চলো।'

ইতস্তত পায়ে গেটটা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রাসাদ, পেছনে পেছনে সাতিল। বারান্দায় বসে কী একটা বই পড়ছিলেন স্যার। রাসাদকে দেখেই উঠে এগিয়ে এলেন তিনি। ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি অনেক ইনটেলিজেন্ট ছেলে দেখেছি, তোমার মতো একজনও দেখিনি।'

'স্যার, আপনি সব কিছু জানেন?'

স্যার ওদেরকে বারান্দায় এনে বসিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় ওই মাঠটা নিয়ে আমরা সবাই যতটা না চিন্তিত ছিলাম, তার চেয়ে বেশি চিন্তিত ছিল—।' স্যার সাতিলের দিকে তাকালেন, 'এই সাতিল। একদিন ও আমার রুমে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, স্যার, মাঠটা রক্ষা করা যায় না? আমি বলেছিলাম, বাবা রে, আমি তো এখানে চাকরি করি। পরিচালনা কমিটি যা করতে চায়, তার বাইরে আমি কিছু করতে পারব না। সে তখন তোমার নাম বলেছিল। আমি তখন সাতিলকে বলেছিলাম, তুমি তোমার মামাকে নিয়ে আসো। স্কুলে যা করতে চায় তা করার সুযোগ করে দেব আমি। আমি অবাক হয়ে যাই—কী চমৎকারভাবে নতুন অঙ্ক স্যারকে স্কুল থেকে বিদায় করার ব্যবস্থা করেছ তুমি!'

ঘরের ভেতর চলে গেলেন স্যার। একটু পর মোটা একটা বই এনে রাসাদের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি যখন ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছিলাম, তখন আমাদের হেড স্যার এই বইটা গিফট করেছিলেন আমাকে। সারা পৃথিবীর বুদ্ধিদীপ্ত মজার মজার গল্প আছে এখানে। পড়ে খুব মজা পাবে, শিখতেও পাবে অনেক কিছু। বইটা তোমাকে দিলাম। অনেক বড় হও তুমি, অনেক বড়।'

চোখে পানি এসে গেছে রাসাদের। বাম হাত দিয়ে বইটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ডান হাত দিয়ে স্যারের পা ছুঁয়ে সে বলল, 'দোয়া করবেন স্যার।'

রাসাদ আর সাতিল চলে যাচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন হেড স্যার। ওদের দেখতে দেখতেই চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন তিনি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছতে মুছতে মনে মনে বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সারা দেশটা এ রকম মেধাবী ছেলে-মেয়েতে ভরিয়ে দাও।'

সাতিলের কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে রাসাদ বলল, 'এবার তুই বাসায় চলে যা, আমি একাই বাসস্ট্যান্ডে যাব।'

রাসাদকে ব্যাগটা দিয়ে চলে যাচ্ছিল সাতিল। দু'পা যেতেই ঘুরে দাঁড়াল সে। কাঁপা কাঁপা গলায় ডাক দিল, 'মামা!'

ঘুরে দাঁড়াল রাসাদ, 'কী, কিছু বলবি?'

মাথা নিচু করে ফেলল সাতিল। কিছুক্ষণ থেমে আগের মতোই কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'না।'

দ্রুত এগিয়ে এলো রাসাদ সাতিলের দিকে। ব্যাগটা পায়ের কাছে রেখে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। সাতিল শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net